সোনার ঈগল
গৌতম রায়

সোনার ঈগল

১৪৩

গৌতম রায়

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

শ্রীমান ঋতদীপকে

প্রকাশকের নিবেদন

এই বইয়ের ৮ নং পাতায় ২৫ থেকে ২৭ লাইনে বাগানসমেত ছাড়া হয়ে যেত। না কিনলে জীবনে একটা বোকামি রয়ে যেত। এই পর্যন্ত বাড়ি হাত বেশ কাটছিল। তারপর—

পরিবর্তে পড়তে হবে

বাগানসমেত বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যেত। না কিনলে জীবনে একটা বোকামি রয়ে যেত। এই পর্যন্ত বেশ কাটছিল। তারপর—

এই ভুল ছাপার জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রকাশক

তিন-চার দিন ধরে আকাশের বুকে কে যেন ঘষা শ্লেটের রঙ ধরিয়ে রেখেছে। বায়না করে না পাওয়া ছোট ছেলের মুখের মতো। তার ওপর মাঝে মাঝে প্রবল বর্ষণও লেগে রয়েছে।

যদিও এখন ঠিক বর্ষাকাল না। মাত্র ক'দিন আগেই কালীপুজো হয়ে গেছে। বাতাসে এখন আলগা শীতের ছোঁয়া।

আমি আর আমার বন্ধু নীল, শখের গোয়েন্দা হিসেবে যে ইতিমধ্যেই বেশ নামটাম কিনতে শুরু করেছে, এই ভারী আর গুমোট বর্ষার দুপুরে নিশ্চুপের মত বসে আছি।

মিনিট পাঁচেক হল আবার বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে। এখন বেশ জোরেই পড়ছে। পশ্চিমের ভেজা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকছে শোঁ-শোঁ করে।

নীলের ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট ঝুল বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে বাইরের বৃষ্টিধোয়া বাগানটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ঝাঁকড়া মাথা বড় বড় গাছগুলো এক নাগাড়ে ভিজে চলেছে।

আড়চোখে একবার নীলের দিকে তাকালাম।

কিছুদিন হল ওর মাথার কাজ হচ্ছে না। গোয়েন্দাগিরিকে ও বলে মাথার কাজ। সত্যান্বেষণ বা রহস্যভেদ বা সত্যসন্ধান ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণগুলো ওর ঠিক পছন্দ না। সে যাই হোক, আপাতত আশেপাশে কোথাও খুন-জখমের খবর নেই। নিদেনপক্ষে চুরিটুরি। বুদ্ধিমান চোরগুলোও আজকাল যেন দেশটেশ ছেড়ে চলে গেছে। যা-ও দু'একটা ছিঁচকে ব্যাপার-স্যাপার চলছে সেসব আবার ওর পছন্দ না।

ওর সঙ্গে থেকে থেকে আমাকেও ঐ বদ-অভ্যাসটা পেয়ে বসেছে। একটা জটিল রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর মধ্যে যে দারুণ থ্রীল থাকে সেটা ঠিক লিখে-টিখে বোঝানো যায় না। এটা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। নীলের মত আমিও প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

'এক নাগাড়ে বৃষ্টি', 'নেই কাজ' এবং কেনটিনিউয়াস লীজার'-এ যখন আমরা দুজনেই ক্লান্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে কাকতালীয়ের মতো হলেও অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সামনে মাথার কাজ এসে হাজির হল।

বৃষ্টিটা বোধ হল তখন একটু ধরার মুখে। একেবারে থামেনি। অল্প অল্প ঝরছে। হঠাৎ নজরে এল নীলের বাগানের লোহার গেট ঠেলে ছাতা-মাথায় দুজন ভেতরে আসছে। একজনকে চিনতে পারলাম। তাতন। এ বাড়ির দু'তিনখানা বাড়ির পরেই থাকে। তাতন আবার আমাদের খুব ন্যাওটা। বিশেষ করে নীল ওর কাছে আইডিয়াল পুরুষ। আসলে তাতনের যে বয়স তাতে করে নীলের প্রতি তার খুব স্বাভাবিক কারণেই আকর্ষণ থাকবে। তেরো চোদ্দ বছরের ছেলেরা প্রায়ই রহস্য রোমাঞ্চে উদ্‌গ্রীব হয়। বইটই পড়ে এরা সকলেই এ বয়সে ক্ষুদে ডিটেকটিভ হতে চায়।

অবশ্য তাতন খুব বুদ্ধিমান ছেলে। ওর গভীর আর তীক্ষ্ণ চাহনি থেকে মনের দীপ্তি বেরিয়ে আসে। এই বয়সেই নিজের লেখাপড়া ছাড়াও নানান ধরনের আউট বুকস্ পড়ে ফেলেছে। সেটা অবশ্য নীলের খানিকটা তাগিদে।

প্রথম যেদিন তাতন এ বাড়িতে এল, তখন কেউই আমরা ওকে চিনতাম না। সরাসরি এসে নীলের সঙ্গে দেখা করল। বেশ সপ্রতিভ। ছিপছিপে চেহারা আর উজ্জ্বল মুখচোখ দেখে নীল বোধহয় ওর ওপর কিঞ্চিৎ আকৃষ্টই হয়েছিল। আমরা দুজনেই যখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, দেখি ও বেশ ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের দুজনকে দেখছে। হঠাৎ নীলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—'আপনিই শ্রীনীলাঞ্জন ব্যানার্জী?'

ওর হাবভাবে আগেই বলেছি নীল আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই বেশ কৌতূহল নিয়েই বলেছিল, 'কিন্তু আমিই যে নীল ব্যানার্জী তুমি বুঝলে কেমন করে?' একটুও দ্বিধা না করে ও উত্তর দিয়েছিল, 'গোয়েন্দারা খুব স্মার্ট হয়। ও'র থেকে আপনাকে বেশী স্মার্ট মনে হল তাই আপনিই যে নীল ব্যানার্জী তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না।'

'কিন্তু আমি যে ও'র থেকে বেশী স্মার্ট তা বুঝলে কেমন করে?'

'আপনার মুখে লেখা আছে। আমি যখন এসে দাঁড়ালাম আপনার চোখ দুটো ভীষণ ছটফট করছিল। মনে হচ্ছিল আপনি আমার সবটাই স্টাডি করে নিচ্ছেন। কিন্তু আপনার বন্ধু কেবল আমার মুখের দিকেই চেয়ে ছিলেন। একজন পারফেক্ট গোয়েন্দা কখনোই এক জায়গায় চোখ ফেলে রাখতে পারে না। তাহলে তার অনেক কিছু দেখার বাকী থেকে যায়।'

আমি আর নীল দুজনেই অবাক হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

নীল নিজে যেমন বুদ্ধিমান—যাদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধির ঝিলিক আছে তাদের ও দারুণ পছন্দ করে। কয়েক সেকেণ্ড নীরবে তাতনের মুখের দিকে

তাকিয়ে থেকে নীল প্রশ্ন করেছিল, 'কিন্তু তোমাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারলাম না।'

'আমি বাপ্পাদিত্য সেনগুপ্ত। সবাই আমাকে তাতন বলে ডাকে। আপনারাও তাই বলে ডাকবেন।'

'কিন্তু তাতনবাবু, তুমি হঠাৎ আমার কাছে কেন ?'

'আমি খুব ডিটেকটিভ বই পড়তে ভালবাসি। অনেক বই পড়েছি। হঠাৎ ওঁর লেখায় আপনার কীর্তিকলাপ পড়ে একজন জ্যান্ত গোয়েন্দার সঙ্গে ভাব করতে এলাম।'

'ফাইন। কিন্তু তোমার বাবা আপত্তি করবেন না।'

'না। বাপিকে বলেছিলাম আপনার সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে। উনি আপনাকে চেনেন।'

'তার মানে তোমার বাবার নাম আদিত্য সেনগুপ্ত ?'

তখন তাতন আর আমার অবাক হবার পালা। চোখ দুটো আরো বড় করে তাতন বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি বুঝলেন কেমন করে ?'

মিটিমিটি হেসে নীল বলেছিল, 'যেমন করে তুমি আমাকেই নীল ব্যানার্জী বলে সনাক্ত করেছিলে ?'

'কিন্তু মেথডটা তো জানতে হবে।'

'হবেই তো। তুমি বাপ্পাদিত্য। জেনারালি আমি গেস্ করতে পারি তোমার বাবার নাম আদিত্য হবে। কেননা আমি আদিত্য সেনগুপ্তকে চিনি এবং তিনিও আমাকে চেনেন।'

'ব্যাস এইটুকুতেই ?'

'না আরো আছে। তোমার মুখের সঙ্গে আদিত্যদার মুখের অনেক মিল আছে। তিন নম্বর তুমি নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও থাক। সাধারণ একটা স্পোর্টস গেঞ্জি, আর হাওয়াই চপ্পল পায়ে দিয়ে কেউ দূর থেকে আসে না। অর্থাৎ তুমি খুব কাছ থেকে এসেছ এবং তিনখানা বাড়ির পরেই আদিত্য সেনগুপ্তর ছেলে যে বাপ্পাদিত্য সেনগুপ্ত হবেই এটা তুমিও চেষ্টা করলে পারতে।'

'কিন্তু আমি যে হাওয়াই চপ্পল পরে এসেছি কি করে বুঝলেন ? এখন তো আমার পায়ে কোন চটি নেই।'

'ভাল করে তাকিয়ে দেখ তোমার পায়ে লেগে থাকা ধুলো এবং ধুলো না লাগা অংশ দিয়ে আর কোন জুতোর আভাস পাওয়া যায় কিনা ?'

আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে তাতন বলেছিল,—'ইউ আর এ জেনুইন ইনভেস্টিগেটর।'

'তুমি কোথায় পড় ?'

'সেন্ট জেভিয়ার্স। ক্লাস এইট।'

'এবার বল, শুধুই আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য এসেছ না অন্য কোন কারণে ?'

'আপনার কি মনে হয় ?'

হেসে নীল বলেছিল, 'তদন্তের কাজে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চাও, এই তো ?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।'

'কিন্তু আদিত্যদা বকাবকি করবেন না ?'

'উনি জানেন আমি আপনার কাছে এসেছি।'

সেই থেকে তাতন প্রায়ই এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করে। যখন ওর খুশী। নীলের ঢালাও অর্ডার। নীল না থাকলেও তাতন ওর লাইব্রেরীতে বসে নানান ধরনের বইটই পড়ে। কারণ নীল ওকে প্রচুর বাইরের বই পড়ার উপদেশ দিয়েছে। ওর মতে না পড়লে কোন জ্ঞান হয় না। আর জ্ঞান না থাকলে চোখ ফোটে না। চোখ না ফুটলে রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু দেখা যায় না।

দূর থেকে তাতনকে বৃষ্টি মাথায় করে আসতে দেখে অবাক হইনি। কিন্তু সঙ্গের ভদ্রলোকটি কে ? এও কি তাতনের মতো কোন রহস্যে উৎসাহী ? তাছাড়া ভদ্রলোক তাতনের সমবয়েসী তো নয়ই, বরং বেশ বয়স্ক।

মিনিট তিনেক পর তাতন এসে ঘরে ঢুকল। বেশ ভিজে গেছে। হাত-পায়ের জল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'নীলকাকু, একটা দারুণ মাথার কাজ আছে। নেবে নাকি কেসটা ?'

তাতন আমাদের কাকু বলে ডাকে। আমি জয়কাকু আর নীল নীলকাকু।

বিছানা থেকে নামতে নামতে নীল বলল, 'সেটা পরে ভেবে দেখব, কিন্তু তাঁকে কোথায় রেখে এলি ?'

'নীচের বৈঠকখানায়।'

'তোর চেনা ?'

'আমার দূর সম্পর্কের জেঠামশাই।'

'ঠিক আছে। আমি নীচে যাচ্ছি। তোরা আয়। তার আগে তোয়ালে দিয়ে মাথাটা ভাল করে মুছে নে। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।'

ও আর দাঁড়ালো না। নীচে চলে গেল।

জেঠামশাই ভদ্রলোকের চেহারাটা নজরে পড়ার মতো। বয়স প্রায় বছর পঞ্চান্ন। রোগা ডিগডিগে। গায়ের রঙটা না কালো না ফর্সা। এগুলো কোন বৈশিষ্ট্য না। মনে রাখার মতো যেটা অর্থাৎ যে কারণে ভদ্রলোককে একবার দেখে ভোলা যায় না সেটা হল ওঁনার মুখের বিশেষ পোট্রেটটি।

মাথার কাঁচাপাকা চুলগুলো কদমছাঁটে ছাঁটা। সব চুলই স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে।

কপালের ওপর এক ইঞ্চি লম্বা থেকে আরম্ভ হয়ে মাথার পিছনে কোয়ার্টার সেন্টিমিটারে গিয়ে ঘাড়ের কাছে মিশে গেছে। কাঁচার থেকে পাকার ভাবটা বেশী। যার ফলে ধূসর রঙটাই চোখে পড়ে। ছোট্ট তেল-চকচকে কপালের শেষে মোটা কেঁদো কালো রঙের দুটো শুঁয়োপোকা লম্বালম্বি শুয়ে থেকে ভ্রূর বিশেষত্ব বাড়িয়েছে। ভুরুটা এতই মোটা যে চুলগুলো চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চুপসানো গাল। ঝুলপি নেই। রগের কাছ থেকে নিখুঁত চাঁছা। গোঁফের বাহারটাও খাসা। অনেকদিন ব্যবহারের পর টুথব্রাশের যেমন
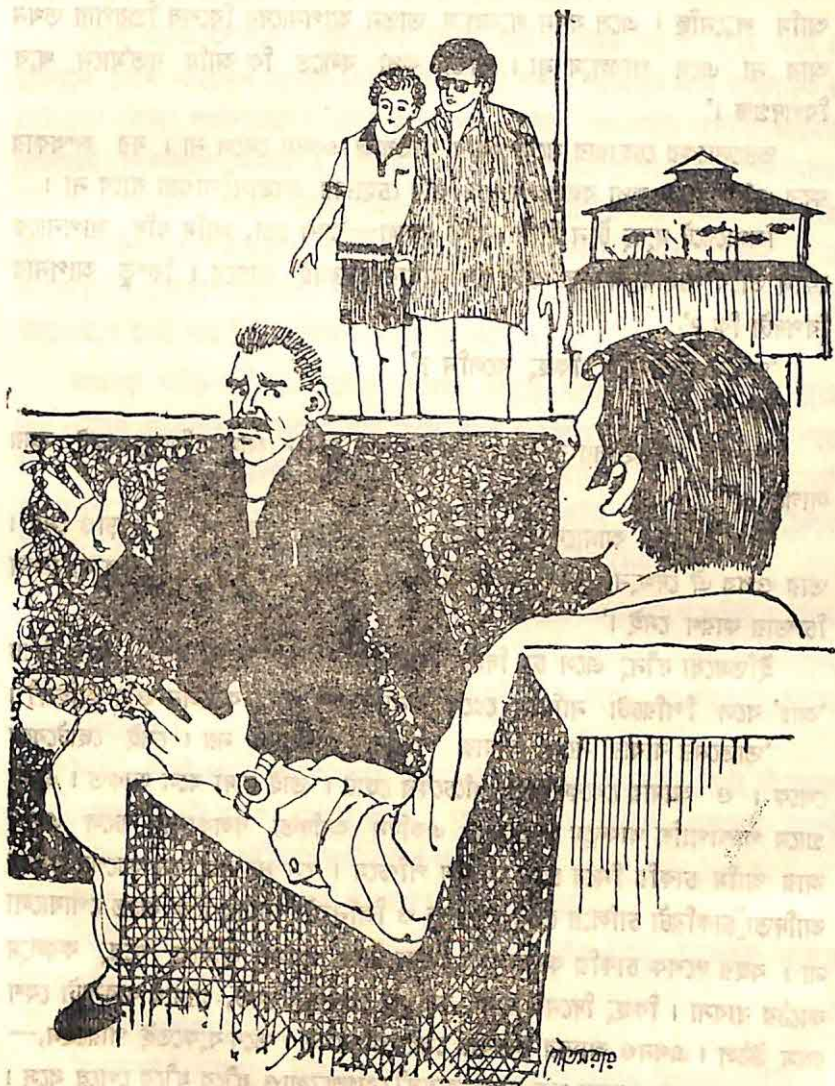
ছেতরানো অবস্থা হয় ভদ্রলোকের ঝাঁটা গোঁফটি তার থেকে ভালো অবস্থায় সাজানো নেই।

তাতনই আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'নীলকাকু, ইনি আমার দূর সম্পর্কের জেঠামশাই অনাদিভূষণ গুপ্ত। আর এঁরা হলেন নীলাঞ্জন ব্যানার্জী আর অজেয় বসু।'

আমরা পরস্পর নমস্কার বিনিময় করলাম। খুব ভারী আর গম্ভীর গলায় অনাদিভূষণ বললেন—'ব্যানার্জী সাহেব, একটা বিশেষ দরকারে আমি আপনার শ্মরণাপন্ন হয়েছি। কলকাতায় এসেছিলুম কেবল এই কারণেই। আপনার নাম আমি শুনেছি। এসে যখন শুনলুম তাতন আপনাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র তখন আর না এসে পারলুম না। সত্যি কথা বলতে কি আমি বর্তমানে খুব বিপদগ্রস্ত।'

ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে গলার আওয়াজ একদম মেলে না। ঘর অন্ধকার করে ওঁকে কেউ কথা বলতে বললে ওঁর চেহারার আভাসও পাওয়া যাবে না।

সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে নীল বলল—'বেশ তো, আমি যদি আপনাকে কোন ভাবে সাহায্য করতে পারি সে আমার ভালোই লাগবে। কিন্তু আপনার বিপদটা কি?'

'তাতন আপনাকে কিছু বলেনি?'

'না।'

'বেশ। আমিই সব বলছি। সময় আছে তো? আমার কিন্তু একটু সময় লাগবে।'

'লাগুক না। আমাদেরও হাতে তেমন কোন কাজ নেই। তাড়াও নেই। তার ওপর ঐ দেখুন বৃষ্টি আবার ঝেঁপে এল। আপনি শুরু করুন, কোন চিন্তার কারণ নেই।'

ইতিমধ্যে দীনু এসে চা দিয়ে গিয়েছিল। গরম চায়ে একটু চুমুক দিয়ে 'আঃ' বলে পিরিচটা নামিয়ে রেখে অনাদিভূষণ শুরু করলেন ওঁর কাহিনী।

'তাতনের বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের নয়। সেই ছোটবেলা থেকে। ও আমার থেকে বছর পাঁচেকের ছোট। তাই দাদা বলে ডাকত। একই গ্রামে পাশাপাশি থাকতুম। তারপর একদিন আদিত্য কলকাতায় চলে এল। আর আমি চাকরি নিয়ে চলে গেলুম পশ্চিমে। সে সব বহুদিন আগের কথা। আদিত্য চাকরিটা চালিয়ে গেল। কিন্তু ও জিনিসটা আমার ঠিক ধাতে পোষালো না। বছর দশেক চাকরি করার পর কিছু টাকা পয়সা জমিয়ে শুরু করলুম কাঠের ব্যবসা। কিছু দিনের মধ্যে, বাই দ্য গ্রেস অব ফেট, আমার ব্যবসাটা বেশ জমে উঠল। এখনও আমার কারবার সেই পশ্চিমেই। তবে বুঝতেই পারছেন,—বয়স হচ্ছে। আর বয়স যত বাড়ে বয়েসী রোগগুলোও ধীরে ধীরে পেয়ে বসে।

তার ওপর বহুদিন প্রায় দেশছাড়া। তাই ভাবলুম অনেক তো হল, এবার কিছুদিন দেশের বাড়ি, মানে বাংলাদেশের জলবাতাসে গিয়ে থাকা যাক।

এই বয়সে জমি কিনে বাড়ি করার মতো দৌড়-ঝাঁপের শক্তি নেই। এনার্জি'ও নেই। গ্রামের দিকে একটা পুরনো মোটামুটি বাড়ি পেলে চলে যাবে এই ভেবে খোঁজ শুরু করলুম। কারণ শহর আমার বা আমার স্ত্রী কারোরই তেমন পছন্দ না।'

এইখানে এসে অনাদিবাবু একটু থামলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড যেন কি ভাবলেন। তারপর ফের শুরু করলেন।

'খোঁজ একটা পেলুম। কলকাতা থেকে ট্রেনে সময় লাগে ঘণ্টা দুই। স্টেশনে নেমে সাইকেল রিক্সায় মিনিট পঁচিশের পথ। গ্রামটার নাম মৃগনাভি। স্টেশনের নাম পলাশমায়া। লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা ছেড়ে গ্রামের একবারে শেষদিকে বাড়িটা। নিরালা নির্জনে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটা অপছন্দ হল না। পাঁচকাঠা জমির ওপর সাবেকী বাড়ি। এ ছাড়াও আম জাম কাঁঠালের বন চারিদিকে। সীমানাটা একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। যদিও সেটা প্রায় জরাজীর্ণ। কোথাও কোথাও সীমানার পাঁচিল ধ্বসে গিয়েছে। আশপাশের গরুবাছুর সেই পথ দিয়ে বাগানে যাতায়াত করে।

অতবড় বাড়ি। বিঘে দশেক জায়গা জুড়ে বাগান। জেনারালি আমি এক্স্পেক্ট করেছিলুম অনেক দাম পড়ে যাবে। কিন্তু দাম শুনে তাজ্জব বনে গেলুম। মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলেই বাড়ির মালিক বাড়ি বাগান সব ছেড়ে দিতে রাজী। এমন কি বাড়ির আসবাবপত্রও তিনি সামান্য কিছু মূল্যের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন। খটকা লাগল। কোন গণ্ডগোল নেই তো!'

অনাদিবাবু পকেট থেকে ভাজির বার করে ধরালেন। নীলের দিকে খোলা প্যাকেটটা এগিয়ে দিতেই ও 'না ঠিক আছে' বলে নিজের ফিল্টার উইল্স্ ধরিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল। জোর একটা টান দিয়ে অনাদিবাবু বলতে শুরু করলেন।

'একটু আধটু খবরাখবর করতেই শোনা গেল বাড়িটা অনেক দিনই ঐ ভাবে পড়ে আছে। ওটা নাকি ভুতুড়ে বাড়ি। রাত-দুপুরে নানান রকমের উদ্ভট দৃশ্যটৃশ্য নাকি গ্রামবাসীরা প্রায়ই দেখে থাকে।'

হঠাৎ নীল জিজ্ঞাসা করল, 'উদ্ভট দৃশ্য বলতে?'

'এই যেমন, রাত্রে নাকি কেউ কেউ দেখেছে ছাদের ওপর জ্বলন্ত মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে—'

'কারা দেখেছে?'

'লোকাল পিপ্ল্। যদিও আমি নিজে এসব ভুতপ্রেত বিশ্বাস করি না।

সারা জীবন নিজের পায়ে খেটে দাঁড়িয়েছি। বাজে বুজরুকী কথাবার্তা বিনা নজিরে মেনে নেবার মতো মানসিকতা আমার নেই। একদিন নিজে গিয়ে কাছাকাছি এক চাষীর বাড়িতে বসে সারারাত বাড়িটা লক্ষ্য করলুম। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। তবু কেনার আগে দোটানায় পড়তে হল। গিন্নীর প্রবল আপত্তি। যাই হোক, গিন্নীকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে রাজী করিয়ে বাড়িটা কিনে ফেললুম।'

নীল আবার অনাদিবাবুর কথার মাঝখানে বাধা দিল, 'আচ্ছা অনাদিবাবু, বাড়িটা কত দিন আগে আপনি কিনেছিলেন ?'

'তা, প্রায় বছরখানেক, এই তো লাস্ট সেপ্টেম্বরে।'

'বেশ, তারপর বলুন।'

'কেনবার পর বেশ ভালো করে বাড়িটা মেরামত করে মোটামুটি ঝকঝকে তকতকে চেহারায় ফিরিয়ে আনলুম। পুরুত দিয়ে পুজো-টুজো সেরে একদিন গিয়ে উঠলুম সেখানে।'

নীল বলল, 'কতদিন আগে ওখানে সীফ্‌ট্‌ করেছিলেন ?'

'গত পয়লা বৈশাখ।'

'তারপর ?'

'প্রথম দিন পনের তো ভয়ে আশপাশের কোন লোক আমার ছায়াই মাড়াতো না। তারপর দেখতে দেখতে যখন মাস দুয়েক কেটে গেল বিনা উপদ্রবে, তখন দেখলুম এক এক করে গ্রামের কিছু মুরুব্বী গোছের লোক এসে আমার সাজানো বৈঠকখানায় জড়ো হতে শুরু করেছেন।

এই ভাবে কেটে গেল আরো চারমাস। এবং সত্যি বলতে কি, নিজে আমি বেশ রাত করে বিছানায় শুতে যেতুম। ওটা আমার বহুদিনের অভ্যেস। তাড়াতাড়ি শুলে আমার ঘুম আসে না। প্রতিদিনই নিজের হাতে সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে দিই। কোনদিনও কোন অদ্ভুত শব্দও শুনিনি। সত্যি বলতে কি, পাঁচজনের কথা শুনলে এত সস্তায় এত সুন্দর একটা বাগানসমেত ছাড়া হতে যেত। না কিনলে জীবনে একটা বোকামি রয়ে যেত। এই পর্যন্ত বাড়ি হাত-বেশ কাটছিল। তারপর—'

হঠাৎ থেমে গেলেন অনাদিবাবু। আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, অনাদিবাবুর মুখটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে উঠছে। একটা ফিকে ভয়ের ছায়া চোখের নীচে ঘনিয়ে এসেছে। দৃষ্টিটা যেন অনেক দূরে কোথায় হারিয়ে গেছে। নীল ওঁর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'থামলেন কেন, বলুন !'

চমক কাটিয়ে অনাদিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এই বলি। হপ্তাখানেক আগে। বোধ হয় শনিবার। হ্যাঁ শনিবারই হবে। যথারীতি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের

হাতে দোতলায় বারান্দার দরজায় খিল দিয়ে আঁতিপাঁতি করে টর্চ দিয়ে চারদিক দেখে শুতে গেলুম। তখন প্রায় রাত সাড়ে বারোটা।'

নীল আবার বাধা দিল, 'এখানে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।'

'বেশ তো প্রশ্ন করুন।'

'আপনি বলছেন বরাবরই নিজের হাতে সব দরজা জানলা বন্ধ করে দেন। আপনার নতুন বাড়িতে কোন চাকর-বাকর নেই?'

'চাকর-বাকর বলতে লোকাল একটা চাষী-বৌ আর তার মেয়ে। প্রথম প্রথম ওরা সন্ধ্যের আগেই কাজটাজ সেরে বাড়ি ফিরে যেত। এখন অবশ্য দিনরাতই থাকে। আর আছে শম্ভু। সেও লোকাল। আমার নিজের চাকর-বাকর সব পশ্চিমী। তারা কেউ দেশ ছেড়ে আসতে চাইল না। বাধ্য হয়েই শম্ভুকে রাখতে হল। রাতদিন থাকার মতো শক্ত সমর্থ লোক কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন শম্ভু নিজে থেকে এসে হাজির। ভূতের ব্যাপারে ওকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলেছিল, 'ভূত আমার কি করবে বাবু, সন্ধ্যের পর আমার কোন জ্ঞানই থাকে না। কথাটা সত্যি। ওর আবার একটু আফিম খাবার নেশা আছে। রাত আটটা-নটার পর আর বাহ্যজ্ঞান বলে কিছু থাকে না ওর। আরো একজন আছে। বাগানের মালী। রাধেশ্যাম। অবশ্য সে বাগানের মধ্যে একটা ছোট্ট ঘরে থাকে।'

'আর একটা প্রশ্ন'—নীল জিজ্ঞাসা করল, 'দেশপাড়াগাঁয় অত রাত পর্যন্ত আপনি একা জেগে থাকেন? কি করেন?'

'আগেই বলেছি তাড়াতাড়ি শুলে আমার ঘুম আসে না। সারা জীবন ব্যবসা করেই সময় কাটিয়েছি। এই বয়সে একটু পড়াশুনোর বাতিকে পেয়েছে। আজকাল প্রচুর রচনাবলী বেরুচ্ছে। তা সেই সব নিয়েই সন্ধ্যেটা বেশ কেটে যায়।'

'সন্ধ্যের দিকে তেমন কেউ আপনার বাড়ি আসে না?'

'তেমন কেউ কি বলছেন মশাই, বলুন সন্ধ্যে হবার আগেই সবাই পালায়।'

'আপনার স্ত্রী?'

'নটার মধ্যেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েন।'

'হুঁ। তারপর কি হল বলুন।'

'আগেই বলেছি ভূত-প্রেতের ভয় আমার কোন কালেই ছিল না। ওসব বিশ্বাস করতেও আমার মন সাড়া দেয় না। অতবড় বাড়িতে মাত্র চারপাঁচটি প্রাণী। অবশ্য চোর-ডাকাতের ভয় আমার আছে। আর তার জন্য আমার একটা লাইসেন্স করা দোনলা বন্দুক আছে। তবু সাবধানের-মার নেই। ভাল করে সব

দেখে নিয়ে তবে শুতে যাই। সেদিনও শুয়েছি। আমার স্ত্রীও পাশে শুয়ে আছেন। আলো নিভিয়ে যথারীতি শুয়ে পড়লুম। ইনসমুনিয়া আমার কোন দিনই ছিল না। তবে ইদানীং শারীরিক পরিশ্রম কম হবার জন্যেই হোক আর যে কোন কারণেই হোক, শুলেই চট্ করে ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ এটা ওটা চিন্তা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। সেদিনও কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। হঠাৎ অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘোরটা কাটতে ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখলুম ঘর অন্ধকার। আর প্রচণ্ড গরমে শরীর বিছানা বালিশ সব ভিজে গেছে। খুব আশ্চর্য লাগল। হঠাৎ এত গরম কেন? তবে কি লোড শেডিং? না, তাই বা হবে কেমন করে? মাথার ওপর দিব্যি পাখা ঘুরছে। কি শীত কি বর্ষা পাখা না চালালে আমার ঘুম হয় না।'

নীল বাধা দিল, 'আপনার ঠিক মনে আছে পাখা চলছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। লোকে আশ্চর্য হলেও এটা ঘটনা। শীতকালে গায়ে লেপ চাপা দিয়েও আমার মাথার ওপর পাখা খোলা থাকে। একে মশারি তায় লেপ, পাখা না চালালে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে যাবে। ছোটবেলা থেকে এ আমার অভ্যেস। অতএব ভুল হবার কোন কারণ নেই। তারপর শুনুন, অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে যখন ভাবছি পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দিয়ে আসি, ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ঘ্যাঁসঘেঁসে আওয়াজ পেলুম। ইন্দ্রিয়গুলো যেন সজাগ হয়ে উঠল। ঐ অস্পষ্ট ঘ্যাঁসঘেঁসে আওয়াজটা কিসের? অনেকক্ষণ পড়ে পড়ে আওয়াজটা শুনলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু বুঝতে পারলুম না।—আলোটা জ্বালানো দরকার এই ভেবে যেই উঠেছি, হঠাৎ—'

আমি স্পস্ট দেখলাম, অনাদিবাবুর মুখটা খুব ভয় পাওয়া রোগীর মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। গলার আওয়াজটাও আর তেমন জোরালো শোনাচ্ছিল না, অতি কষ্টে তিনি বললেন—

'বিশ্বাস করুন ব্যানার্জী সাহেব, মোষের গায়ের মতো অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা লালচে আভাস এসে পড়লো কোথা থেকে। তারপর আলোটা যেন ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। আমার আর বাতি জ্বালানো হল না। হতবুদ্ধির মতো শুয়ে রইলুম।

তবু, প্রথমটা বিস্মিত হলেও ধীরে ধীরে উপস্থিত সহজাত বুদ্ধিটা ফিরে আসতে লাগল। কোন কিছুই কারণ ব্যতিরেকে হয় না। মট্‌কা মেরে চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে ভাবলুম দেখাই যাক না ঘটনাটা কি? ঘাড় না ফিরিয়ে চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলুম আলোর উৎসটা কোথায় তাই দেখবার জন্যে।

কিন্তু কিছুই আমার বোধগম্য হল না। মশার উৎপাতের জন্যে দরজা-জানলা বন্ধই থাকে। তাই বাইরে থেকেও আলো আসতে পারে না। একবার ভাবলুম গিন্নীকে ডাকি। আস্তে আস্তে ঘাড় কাত করে দেখি গিন্নী ওপাশে মুখ ফিরিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। এদিকে আলোটাও যেন ক্রমশ বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থায় এল যখন ঘরের প্রায় সব কিছুই চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে।

বাঁ-দিকে আমার বই রাখার আলমারি। আলমারির বইগুলো বেশ দেখা যাচ্ছে। ডানদিকের কোণে স্টীল আলমারি। আমার শোবার ঘরে একটা বিরাট আয়না আছে। আয়নায় প্রতিফলিত লাল আলো চকচক করছে। স্টীল আলমারির পাশে সম্পূর্ণ-সোনালী পাথরে-তৈরী ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তির উপরও আলোটা ঠিকরে পড়ছে। এমন কি আমার পড়ার টেবিলের উপর রাখা চকচকে ফাউন্টেনপেনের সোনালী ক্যাপের গায়েও আলোটা রুবীর মতো জ্বলছে।

সে এক বড় বিশ্রী অস্বস্তি। একবার ভাবলুম উঠে পড়ি। নিশ্চুপের মতো শুয়ে শুয়ে ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়ার কোন মানে নেই। সত্যি কথা বলতে কি, সেই মুহূর্তে ভয় যে একদম পাইনি তা নয়। আকাশপাতাল ভেবেও লাল আলোটার কোন মানে খুঁজে পাচ্ছিলুম না। তার ওপর লোকমুখে শোনা এ বাড়ি সম্বন্ধে নানান ভূতুড়ে গল্প। যতই শক্ত মনের লোক হই না কেন, রাতের নিজস্ব একটা ভয় দেখানোর শক্তি আছে। দিনের আলোয় যা নিতান্তই আজগুবি মনে হয় রাতের অন্ধকারে তাই অন্যকিছু হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাই মনের খানিক দুর্বলতা কাটিয়ে যখন উঠতে যাব, হঠাৎ মনে হল আলোটা যেন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। আমার অনুমান মিথ্যে নয়। একটু পরে সেটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আর সেই অস্পষ্ট ঘ্যাঁসঘেঁসে আওয়াজটাও তখন আর নেই।

মিনিট কয়েক স্থাণুর মতো বসে ভাবতে লাগলুম। কি হল এতক্ষণ ? কি দেখলুম ? একি সত্যি, না আমার মনের ভুল ? আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামলুম। সুইচ টিপে ঘরের বড় আলোটা জ্বালালুম। কোথাও কিছু নেই। শোবার আগে যেমন ছিল সব তেমনি ঠিকঠাক রয়েছে। কোন বিসদৃশ কিছু চোখে পড়ল না।

এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লুম। একবার ভাবলুম স্ত্রীকে ডাকি। কিন্তু সে বেচারা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাছাড়া অত রাত্রে তাকে ডেকে তুলে একটা আজগুবি কাহিনী শোনানোর কোন মানে হয় না। একটু শক্ত ধাঁচের মেয়ে হলে হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু আমার স্ত্রীকে

তো আমি জানি। এসব শুনলে মূর্চ্ছা যাবে। তাই সে রাত্রে আর কাউকে কিছু না জানিয়ে শুয়ে পড়লুম।

পরদিন ভোরে কিন্তু সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হল। তবু দিনের আলোয়, কাউকে কিছু না জানিয়ে তন্নতন্ন করে ঘরটাকে পর্যবেক্ষণ করলুম। কিন্তু কোথাও সামান্যতম হদিশও কিছু পেলুম না। শেষ পর্যন্ত উড়িয়ে দিলুম। 'ও কিছু না', 'মনের ভুল' এই সব ভেবে সারাদিন নিজের কাজ নিয়ে মেতে রইলুম। তারপর যথারীতি খাওয়া-দাওয়া সেরে বই-টই পড়ে শুয়ে পড়লুম। সেদিনও আগের দিনের মতো কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেল, অস্পষ্ট ঘ্যাঁসঘেঁসে আওয়াজে। আর একটু পরেই দেখতে পেলুম সেই রহস্যময় আলোটা সমস্ত ঘরটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ঠিক আগের দিনের মতো। তবে নতুন এই যে, আগের দিনে আলোটা ছিল টকটকে লাল। সেদিন তার রঙ পাল্টে গেছে। ঘন সবুজ আলোয় সমস্ত ঘরটা রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

আগের দিনের লাল আলোটাকে দিনের আলোয় রাতের বিভ্রম বলে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু পরের রাত্রে সেটাকে ভুল ভাবব কেমন করে? এ যে স্পষ্ট সবুজ আলো। ওদিন কিন্তু বিছানায় উঠে বসলুম না। গতরাত্রের মতো সেই ভয়টাও তেমন ছিল না। কেমন একটা কৌতূহল পেয়ে বসল। কি আর কেন-র কৌতূহল।

কতক্ষণ টানটান চোখ মেলে শুয়েছিলুম জানি না, কিছুক্ষণ পর আলোটা আগের দিনের মতো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

তারপর থেকে প্রতি রাত্রেই একই ঘটনা। একই সবকিছু। কে যেন আমার অলক্ষ্যে একটা প্রোজেক্টারে অদৃশ্য ফিল্ম চালিয়ে দিয়ে প্রতি রাত্রে ভেল্কি দেখাচ্ছে। কিন্তু কি তার উদ্দেশ্য? কি সে করতে চায়? কাউকে বলতেও পারি না। বললে যা-ও বা গ্রামের দুচারজন সজ্জন লোক আমার বাড়িতে যাতায়াত করছেন তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে। স্ত্রীকেও বলতে পারি না। ঝি-চাকরকেও না। এ সব শুনলে ওদের কি আর ওবাড়িতে ধরে রাখতে পারব? বিশেষ করে আমার স্ত্রী যা ভীতু।'

'আচ্ছা, একটা কথা,' নীল বলে উঠল, 'একদিন দেখলেন লাল আলো, তার পরের দিন সবুজ, কিন্তু বাকী ক'দিন?'

'পিকিউলিয়ার। এক একদিন এক এক রকমের আলো। কোনদিন ভায়োলেট, কোনদিন হলুদ, আবার কোনদিন বা অ্যাম্বার। কিন্তু শেষদিন মানে গতকাল যা দেখেছি—উঃ কি বীভৎস! এখনো পর্যন্ত ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে

ওঠে। আমার সাতান্ন আটান্ন বছর বয়সে এমন অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনার অভিজ্ঞতা কোনদিনও ঘটেনি। কোন রকমেই বুদ্ধি দিয়ে আমি এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না, তাই—'

'কিন্তু এমন কি ঘটনা, যার জন্যে আপনাকে আমার কাছে ছুটে আসতে হল ?'

'বলছি। খাওয়া-দাওয়া সেরে গতকাল ইচ্ছে করেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লুম। গিন্নীও আমাকে অত তাড়াতাড়ি শুতে দেখে একটু অবাক হয়েছিল। শরীরটা খারাপ বলে আলো নিভিয়ে মটকা মেরে পড়ে রইলুম। খানিক পরেই গিন্নীর নাক ডাকার আওয়াজ পেলুম।

ধীরে ধীরে চোখ খুলে ঘরের প্রতিটি কোণে সজাগ দৃষ্টি ফেলে রাখলুম। কোথাও কোন শব্দ নেই। কেবল মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসা ঝিঁঝির ডাক ছাড়া। অবশ্য দেশপাড়াগাঁ, বুঝতেই পারছেন, ক্বচিৎ কখনও শেয়াল-টেয়ালের ডাক ভেসে আসা বিচিত্র নয়। দু-একবার আমার বাগানের সীমানার ওপাশে লম্বা বাঁশবনের দিক থেকে শেয়ালের চীৎকারও শুনেছিলুম।

এই ভাবে অনেকক্ষণ কেটেছে। ঘরের বড় দেওয়াল-ঘড়িতে বারোটা, সাড়ে বারোটা, একটা আর দেড়টার ঘণ্টাগুলোও একে একে শুনলুম। দেড়টা বেজে যাবার পরও যখন কোন রহস্যময় আলোটালোর দেখা পেলুম না, তখন মনে হল আজ আর বোধহয় কিছু ঘটবে না।

তাছাড়া নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে একা একা আর কতক্ষণই বা জেগে থাকা যায়। আস্তে আস্তে চোখের পাতাটা বুজে আসছিল। ব্যানার্জী সাহেব, কি বলব আপনাকে, একবার মাত্র চোখের পাতাটা বুজিয়েছি হঠাৎ কট্ করে একটা শব্দ হল। হ্যাঁ, আমি আওয়াজটা স্পষ্ট শুনেছিলুম! সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা খুলতেই দেখি সারা ঘরে একটা হাল্কা আলোর আভা।'

'আওয়াজটা ঠিক কি ধরনের তা মনে আছে ?'

'আছে। বেড-ল্যাম্পের সুইচ অফ করলে যেমন কট্ করে একটা আওয়াজ হয় ঠিক সেই রকম। অন্তত সেই সময় আমার তাই মনে হয়েছিল। তাই স্বভাবতই আমি 'কে' 'কে' বলে চীৎকার করে উঠেছিলুম।'

'তারপর ?'

'কেউ কোন উত্তর দিলে না। কিন্তু অন্ধকারে একটা চাপা হিসহিসে শব্দ পেলুম। যেন কেউ বলতে চাইছে 'চেঁচিও না।'

'শুনতে আপনার কোন রকম ভুল হয় নি ?'

'ঠিক স্পষ্ট নয় ত। তবে মনে হল ঐ রকমই। তারপর, আমি আর

কোন কথা না বলে বিছানার ওপর খাড়া হয়ে বসে রইলুম। ঠিক আগের রাতগুলোর মতো আবার সেই অদৃশ্য আলোটা বাড়তে বাড়তে সারা ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ল।'

'এবারের রঙটা কি?'

'ব্লু, আলট্রামেরিন ব্লু। সমস্ত ঘরটায় যখন আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে হঠাৎ দেখলুম সেই ব্লু আলোর মধ্যেই একটা উজ্জ্বল পিঙ্ক কালারের টেনিস বলের মতো গোল আলো নাচতে নাচতে ঘরটার এপাশ থেকে ওপাশে খেলে বেড়াচ্ছে। আলোর বলটা কতক্ষণ নাচানাচি করেছিল মনে নেই, কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখলুম ওটা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বাস করুন ব্যানার্জী সাহেব, ভয়ে আর উত্তেজনায় তখন আমার সাধারণ জ্ঞানটুকুও লোপ পেয়েছিল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি চীৎকার করে উঠেছিলুম 'কে কে' বলে।'

নীল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো বললেন আপনার স্ত্রী পাশে শুয়েছিলেন, তা আপনার চীৎকারে উনি জেগে উঠলেন না?'

'বলছি, সব বলছি এক এক করে। আপনার মতো সেই মুহূর্তে আমিও ভেবেছিলুম আমার চীৎকারে হয়ত সে উঠে পড়বে—কিন্তু…'

সহসা অনাদিবাবু চুপ করে গেলেন। নীল গভীর মনোযোগ দিয়ে অনাদিবাবুকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। ওঁকে থামতে দেখে নীল সামান্য অধৈর্য হয়ে বলল, 'থামলেন কেন অনাদিবাবু, তারপর কি হল বলুন?'

ভদ্রলোককে তখন রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। একটু দম নিয়ে বললেন, 'বিংশ শতাব্দীতে বসে আমার পরের কথাগুলো শুনলে আপনার স্রেফ গাঁজাখুরি বলেই মনে হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই যে আমারা এখানে সবাই বসে আছি এটা যেমন সত্য, আমার এর পরের প্রত্যেকটা বক্তব্য তেমনি সত্য। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল আমার চীৎকারে হয়ত আমার স্ত্রী জেগে উঠেছে। চকিতে পাশে তাকাতেই দেখি কোথায় আমার স্ত্রী? বিছানা একদম খালি। নিভাঁজ শূন্য শয্যাটা যেন দাঁত ভেঙে হাসছে। মাথাটা ঘুরে গেল। রমা গেল কোথায়? আমার স্ত্রীর নাম রমা। রমার নাম ধরে আমি চীৎকার করে জোরে ডাকতে গেলুম। কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুলো না। স্বপ্নের মধ্যে চীৎকার করলে যেমন আওয়াজ হয় না ঠিক সেই রকম। আবার আমি ডাকলুম। প্রাণপণ চীৎকারে। কিন্তু গলা দিয়ে শব্দহীন হাওয়া ছাড়া আর কিছুই বেরুলো না। সেই মুহূর্তে ভয়ের চেয়ে কান্না এল বেশী। রমা গেল কোথায়? শেষকালে নিজের জেদের বশে ভুতের হাতে রমাকে হারাতে হল! আবার আমি চীৎকার করতে গেলুম। পরিবর্তে শুনলুম বহুদূর থেকে

ভেসে আসা এক অদ্ভুত আর চাপা শয়তানী হাসি। হাসিটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই দেখি, উঃ—'

অনাদিবাবু তাঁর কাহিনী থামিয়ে মুখ নীচু করে মাথার চুল খামচে ধরেছেন।

'কি হল অনাদিবাবু? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? একটু জল খাবেন?'

ঐ অবস্থাতেই অনাদিবাবুকে ধীরে ধীরে মাথা নাড়াতে দেখলাম। নীল ইঙ্গিত করতেই আমি উঠে গিয়ে একগ্লাস জল এনে দিলাম। জলটল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'ঘরের নীল আলোর মধ্যে যে গোলাকার পিঙ্ক আলোটা এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, আমি স্পষ্টই দেখলুম আমার স্ত্রীর কাটা মুন্ডুটা সেখানে ভাসছে। আর টুপ টুপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলুম। ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ পাশ ফিরলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি করে আমার খাটে একটা আওয়াজ হল। পাশে তাকিয়ে দেখি আমার উবে যাওয়া স্ত্রী আমার দিকে পাশ ফিরে শুলো। আর, তখনি আমি দেখলুম আমার স্ত্রীর দেহে মাথাটা নেই। সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখি মাথার কাছে জানলাটা খোলা আর দিনের আলো ফুটফুট করছে।'

'কিন্তু আপনার স্ত্রী? তাঁর কি হল?

'যেমনকার মানুষ তেমনই আছে। ওকে দেখে মনেই হয় না গতরাত্রে আমার ঘরে কোন ঘটনা ঘটেছিল। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যানার্জী সাহেব।'

নীল আর একটা সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ নীরবে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর ধীরে ধীরে অনাদিবাবুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনার সব কথা শুনলাম। এই আপাত ভুতুড়ে ব্যাপারে আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন?'

উত্তরে অনাদিবাবু থেমে থেমে বললেন, 'দশটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছি। সত্যি কথা বলতে কি, গত রাত্রের পর ও বাড়িতে আর আমি থাকতে পারছি না। স্ত্রীকেও একা রেখে আসতে সাহস হয়নি। তাতনের বাবাকে সব খুলে বললুম। ও আমাকে বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার পরামর্শ দিলে। কিন্তু তখনই আমাকে জোর করে আপনার কাছে নিয়ে এল। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। শেষকালে ভূতের কাছে আমাকে হার মানতে হবে?'

'আপনি কি স্থির করেছেন ? বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন ?'

'বিক্রি করব বললেই তো করা যাবে না। কেন না দুর্নামের জন্যে বাড়িটা বহুদিন খালিই পড়ে ছিল। জেদের বশে বাড়িটা কিনেছি। এখন বিক্রি করতে গেলে প্রথমত সবার কাছে হাস্যাস্পদ হতে হবে। দ্বিতীয়ত খদ্দেরও চট্ করে পাব বলে মনে হয় না।'

'তাহলে কি করবেন ?'

'আপনি গোয়েন্দা মানুষ। জানি এসব ব্যাপারে আপনার কিছু করার নেই। বুদ্ধিমান লোক হিসেবে নিছক পরামর্শ'ই চাইছি, এখন আমি কি করতে পারি আপনিই বলে দিন।'

অনেকক্ষণ বাদে নীলের মুখে সেই রহস্যময় হাসিটা দেখতে পেলাম। মিটিমিটি হাসতে হাসতে ও বলল—'তুমি কি বল তাতনবাবু ? তোমার জেঠুর কি বাড়িটা ছাড়া উচিত ?'

তাতনকে কিন্তু কোন রকম দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখলাম না। ও স্পষ্টই বলে দিল, 'কোন মতেই না নীলুকাকু। এ একটা দারুণ মাথার কাজের খোরাক। বাড়ি বিক্রি করলে সে খোরাক হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'সাবাস !' বলে নীল অনাদিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল 'ভাইপো কি বলছে শুনলেন ?'

'আগেও শুনেছি। কিন্তু—'

নীল কয়েক সেকেণ্ড কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'আপনার কেসটা আমি টেকআপ করলে আপনার কোন অসুবিধে আছে ?'

'কি বলছেন ব্যানার্জী সাহেব ? অসুবিধে আমার নয়। অসুবিধে আপনার। এসব তো গোয়েন্দাদের কাজ নয় ? তাই—'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে আমার আবার প্রেততত্ত্ব নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাটি করার ইচ্ছে বহুদিনের। সুযোগ পাই না তো। বেশীর ভাগ লোকই ওঝা-টোঝা ডেকে বসে। ভাগ্যিস তাতন আপনাকে আমার কাছে এনেছিল নইলে এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেত।'

ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে অনাদিবাবু বললেন, 'আপনার যখন এই কেসটায় এতই ইনটারেস্ট তখন দেখুন কি করতে পারেন। তবে বাড়িটা শেষ পর্যন্ত যদি আমার হাতছাড়া না হয় আর এর মধ্যে থেকে সত্যিকার ভুতুড়ে রহস্যটা টেনে তুলে আনতে পারেন তাহলে কেবল কৃতজ্ঞতা নয়—আপনাকে সামান্য সম্মানমূল্য দিতেও আমি কার্পণ্য করব না।'

'বেশ, আপনার মতামত জানলাম। এবার তাহলে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন। বাড়িটা সম্বন্ধে আপনি কতটুকু কি জানেন বলুন।'

'তেমন বিশেষ কিছু না। দালাল মারফত বাড়িটার সন্ধান পাই। বাকী যা কিছু সে তো গ্রামের লোকেদের কাছ থেকেই জানতে পারি।'

'অরিজিন্যাল বাড়ির মালিক কে ছিলেন ?'

'দলিল থেকে যতদূর জানা গেছে বাড়িটা অনেকদিনের পুরনো এক জমিদার বাড়ি। মল্লিকদের চার পাঁচ পুরুষ আগে এবাড়ি যিনি তৈরী করেন তাঁর নাম রামসদয় মল্লিক। পরে পুত্র প্রপৌত্রের হাত ঘুরে আসে রামসুন্দর মল্লিকের হাতে। মল্লিক বংশের শেষ উত্তরাধিকার হিসেবে এ বাড়ির মালিক হন তারই ছেলে রামমাণিক্য মল্লিক। তারপর অবস্থা পড়ে যাবার জন্যেই হোক আর যে কোন কারণেই হোক পলাশমায়ার 'মল্লিকভবন' বিক্রি করে দেন রামমাণিক্যবাবু। তা সেও তো প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল। কলকাতার চন্দ্রভূষণ গুপ্তা নামে একজন পাটের ব্যবসায়ী বাড়িটা কেনেন রামমাণিক্য বাবুর কাছ থেকে। দশবছরের মধ্যে আর হাত-বদল হয়নি। দশবছর পর, না, ঠিক ন'বছর পর চন্দ্রভূষণবাবুর কাছ থেকে বাড়িটা বছর খানেক হল আমি কিনি। এছাড়া আর কোন ইতিহাস আমার জানা নেই।'

'চন্দ্রভূষণবাবু কেন বাড়িটা বিক্রি করছিলেন তা কিছু বলেছিলেন ?'

'ঐ একই ব্যাপার। ভূতের বাড়ি বলে।'

'উনি থাকেন কোথায় ?'

'এখন কোথায় থাকেন জানি না তবে বছর খানেক আগে থাকতেন রসা রোডের দিকে। দলিলে ঠিকানাটা লেখা আছে।'

'ঠিকানাটা আমার দরকার। আপনি তাতনকে দিয়ে ওটা পাঠিয়ে দেবেন। আর একটা কথা। আপনি এখন উঠেছেন কোথায় ?'

'ওঠাউঠির আর কি আছে। আদিত্যর বাড়ি তো' আছেই।

'আপাতত আপনার স্ত্রীকে ওখানেই রাখার বন্দোবস্ত করুন। অন্তত কিছুদিন। আপত্তি নেই তো—।'

'আপত্তি আবার কি ? আদিত্য ওর বৌদিকে মাথায় করে রাখবে। সেসব আমি ভাবছি না। কিন্তু আমার বৌকে জবাব দোব কি ?'

'সে আদিত্যদাকে বলে ম্যানেজট্যানেজ করে নিন। আপাততঃ আমার মনে হয় মেয়েদের ওখানে না থাকাই উচিত। এবং আপনার স্ত্রীকেও এ প্রসঙ্গে কিছু জানাবার দরকার নেই।'

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন তাই হবে। আর আমি ?'

'আপনি পলাশমায়ায় যেমন আছেন তেমনিই থাকুন। বাড়িটা খালি থাকুক এটা আমি চাই না। ভয়-টয় করবে নাকি ?'

'আগেই বলেছি ভয়-টয় আমার একটু কম। তাহলে খুব শিগগীরই আপনাকে

ওখানে আশা করছি।'

নীল মৃদু হেসে বলল, 'এতবড় একটা লোভনীয় আহ্বান, না গিয়ে থাকা যায়?'

'তাহলে আজ উঠি, তাতন চ'—বলতে বলতে অনাদিবাবু উঠে পড়লেন। তাতনের কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওঠার ইচ্ছে ছিল না। ও বলল, 'জেঠু তুমি বাড়ি চলে যাও। বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি একটু পরে আসছি।'

অল্প একটু হেসে অনাদিবাবু চলে গেলেন।

উনি চলে যাবার পর প্রথম কথা বললাম আমি, 'কিরে নীল, এ তো বেজায় ঝামেলার কেস।'

নীল অন্যমনস্কের সুরে বলল, 'কেন? কিসের ঝামেলা?'

'এই সব ভূতটুত—শেষকালে না আবার—'

'তোর এসব বিশ্বাস হয়?'

'তুই ডাকাত। তোর ভয়ডর নেই জানি—কিন্তু স্পিরিটকে তুই উড়িয়ে দিতে পারিস না।'

'দেখেছিস কোনদিন?'

'ভগবানকে কোনদিন দেখেছিস? দেখিসনি। কিন্তু বিশ্বাস করিস।'

সহসা নীল মুখে কিছু বলল না। আমার দিকে চেয়ে অল্প অল্প ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, ঠিক আছে, এবারে নয় তোকে জড়ালাম না। তাতনই থাকুক, কি তাতন?'

'ওঃ সিওর। এমন ইন্টারেস্টিং কেস।'

'তোর আবার ভূতের ভয় নেই তো?'

'দূর, ওসবে আমার একদম বিশ্বাস নেই। কবে যাবে কাকু?'

'তোকে ঠিক সময় খবর দিয়ে দোব। আমার টাস্ক হয়েছে?'

'হ্যাঁ। কি যেন তোমার প্রশ্নটা ছিল?'

'ভুলে গেছিস? তাহলে আবার বলছি শোন—রাজারাজড়ার খেয়ালে কার লেজ কাটা গিয়েছিল?'

'ফেব্রুয়ারি।'

'কারেক্ট। বাট হাউ?'

'জুলিয়াস সিজার রোমের সম্রাট হবার পর নিজের জন্মমাস কুইন্টিলিসের নাম পাল্টে রাখলেন জুলিয়াস। যার থেকে হল জুলাই। মাসটাকে একদিন বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তিনশ পঁয়ষট্টি দিনকে তো আর তিনশ ছেষট্টি করা যায় না। তাই ফেব্রুয়ারি মাসের ত্রিশ দিন থেকে একদিন কেটে জুলাইতে ঢুকিয়ে দিলেন। এরপর যখন আগাস্টাস সম্রাট হলেন তিনিও তাঁর জন্মমাস

সেক্সটিলিসের নাম দিলেন আগাস্টাস বা আগস্ট। ঐ মাসে একদিন বাড়ালেন। ফেব্রুয়ারির ল্যাজ কেটে। লিপইয়ার বাদ দিয়ে ল্যাজকাটা ফেব্রুয়ারিকে তাই এখনও আটাশ দিনে খুশী থাকতে হচ্ছে।'

'থ্যাংক য়্যু। এবার নেক্সট দিনের টাস্কটাও নিয়ে রাখ। সময় তিনদিন। প্রশ্ন তিনটে। বাঁদরের ক'টা পা? কোন্ খাঁ সাহেব চীনের রাজা ছিলেন? সিরাজদ্দৌল্লার বাবার নাম কি?'

তাতন টাস্ক নিয়ে চলে গেল। ওর কিশোর মনটাকে শানানোর জন্যে নীল মজার মজার ধাঁধা দিয়ে যায়। বুদ্ধি খাটিয়ে বা নানান বইটই ঘেঁটে ও নীলের দেওয়া প্রবলেমগুলোর উত্তর ঠিক করে রাখে। এতে ওর সাধারণ জ্ঞানটাও বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে পড়াটাও হয়ে যায়। তাতন চলে গেলে নীলকে একা পেলাম। ভবি ভোলার নয়। আমিও ভুলিনি। তাই পুরনো প্রসঙ্গে আবার ফিরে এলাম। ওকে বললাম, 'তাহলে তুই মাথা গলাবি?'

'তুই তো জানিস আমি চট্ করে কথার খেলাপ করি না।'

'কিন্তু—'

'সত্যিই যদি তুই ভয় পেয়ে থাকিস তোকে তো বারণই করলাম এবারে আমার সঙ্গে থাকতে—'

'আমি তো তা বলছি না, কিন্তু অশরীরী শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে তোকেও বারণ করছি— নইলে আমার আর থাকতে কি?'

নীল হোহো করে হেসে উঠল। তারপর বলল—বুঝেছি, তোর ব্যাপারটা হল মাছ খাব কিন্তু কাঁটা হাতে লাগাবো না। ঠিক আছে এখন ওঠ। আজ খিচুরি খাবার আইডিয়াল ডে। তাতনকে খবরটা দিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রভূষণবাবুর রসা রোডের বাড়িতে গিয়ে যখন পেঁছিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যে। সাজানো গোছানো তিনতলা বাড়ি। আধুনিক কায়দায় তৈরী। ধনী লোকের বাড়ি তা দেখলেই বোঝা যায়। নীলের মরিসটা বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে সামনের ছোট্ট গ্রীলের দরজা ঠেলে তিন ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে আমরা সদরে এসে দাঁড়ালাম। দরজা বন্ধই ছিল। বেল টিপতে একজন ভৃত্য শ্রেণীর লোক এসে দরজা খুলে জানতে চাইল কাকে চাই।

নীল জিজ্ঞাসা করল, 'গুপ্তাসাহেব বাড়ি আছেন ?'

'জী হাঁ।'

পকেট থেকে নীল ওর ভিজিটিং কার্ডটা লোকটার হাতে দিয়ে বলল, 'সাহেবকে বল আমরা ওঁনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

লোকটা কার্ডটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

এক মিনিটের মধ্যেই লোকটা ফের ফিরে এল। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসাল ভেতরের সাজানো গোছানো ড্রইংরুমে।

কেবল মাত্র সাজানো গোছানো বললে বোধ হয় কমই বলা হয়। আধুনিক কায়দার যত রকমের বিলাসসামগ্রী আছে তা দিয়ে পরিপাটি করে ঘরখানা ঠাসা।

'ঠাসা' কথাটা এখানে ব্যবহার করতে বাধ্য হলাম। কারণ গৃহস্বামীর পরিমিত শিল্পজ্ঞানের সত্যই বড় অভাব। প্রাচুর্য আছে, নেই তা সুন্দর করে রাখার মতো সৌন্দর্যবোধ।

একটু পরেই একজন হৃষ্টপুষ্ট নাদুসনুদুস প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। গায়ের রঙটা উজ্জ্বল গৌর। মাথায় কাঁচাপাকা কোঁচকানো চুল। কিন্তু খুব ছোট করে মোড়ানো। ঘাড়টাড় কিছু নেই। মাথার শেষেই আরম্ভ হয়েছে পিঠ। গোঁফদাড়ি নিখুঁত কামানো। চোখেমুখে এক অদ্ভুত বোকামী আর গোবেচারা ভাব।

গায়ে আদ্দির ফিনফিনে পাঞ্জাবী। নধরকান্তির সবটাই পাঞ্জাবী ভেদ করে দেখা যাচ্ছে। পরনে জয়পুরী সিল্কের দামী চকরাবকরা লুঙ্গি। পায়ে স্যাণ্ডাক চটি।

ওঁনাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই আমরা তিনজন উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললেন 'আরে বোসেন বোসেন। তো, এ কার্ডটা আপনারা ভেজিয়েছেন ?'

বসতে বসতে নীল বলল 'হ্যাঁ, আমিই নীলাঞ্জন ব্যানার্জী।'

নীলের দেখাদেখি আমরাও বসলাম। ভদ্রলোকও বসতে বসতে বললেন, 'আমার নাম চন্দ্রভূষণ গুপ্তা। লেকিন হামার কাছে পরাইভেট ইনভেসস্টি-গেটর কিঁউ ? হামি তো কোন ঝুটা কাম করেনি।'

নীল হেসে বলল 'নাঃ মিঃ গুপ্তা আমি যে কারণে এসেছি সেখানে আপনার দিকে ভয়ের কিছু নেই। সামান্য কয়েকটা ইনফরমেশন ছাড়া।'

'হাঁ হাঁ জরুর! লেকিন হামি কোন' ইনফোরমেশান দিবে ? হামার তো কুছ জানা নেই।'

'আছে মিঃ গুপ্তা। নইলে আর শুধু শুধু আপনাকে বিরক্ত করব কেন ?'

'আছে, আপনি বলসেন ? তা হ'লে তো কুন কোথাই নেই—বোলেন। আপনার জন্যে হামি কি করতে পারে ?'

নীল ওর সিগারেটের প্যাকেট বার করে গুপ্তা সাহেবের দিকে এগিয়ে ধরে। উনি হাতজোড় করে বলেন 'হামি ইস্মোক করে না।' বলেই উনি পকেট থেকে একটা রুপোর চ্যাপ্টা ধরনের ডিবে বার করে সুগন্ধি মশলা জাতীয় কিছু মুখে পুড়লেন।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল, 'কিছুদিন আগে, সে অ্যাবাউট টেন ইয়ার্স ব্যাক, আপনি পলাশমায়ার মৃগনাভি গ্রামে কোন বাড়ি কিনেছিলেন ?'

চন্দ্রভূষণবাবুর মুখের রঙ স্বাভাবিক হয়ে গেল। তেঁতুলবিচির মত দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললেন—হাঁ হাঁ মনে পড়িয়েছে। বলেই উনি একটা বিদকুটে স্বরে ডাক দিলেন, 'হেয়ামভাইয়া'।

নীল আমি আর তাতন তিনজনেই চমকে উঠেছিলাম—। নীল বলে উঠল, আজ্ঞে ?'

গুপ্তাসাহেব হাসি কচলাতে কচলাতে বললেন, 'নোহি বাবুজী, আপনাকে কুছ বলছে না। থোড়া চায়েকা বন্দোবস্ত করতে হোবে না ? তো রাম ভাইয়া কে ডাকছে। আসলে শালা কানমে কুছ ডালা হ্যায়—'

নীল ভদ্রতা করল, 'না না চায়ের কোন দরকার নেই—আমরা দুএকটা প্রশ্ন করেই চলে যাব—'

'একটা কেনো, হাজারটা কোরেন—লেকিন হামার বাড়িতে পর্থম এলেন —হেয়ামভাইয়া—'

রামভাইয়া এসে হাজির হলেন। মানে আমাদের দেখা সেই প্রথম লোকটি। পূর্বের মতই হাসি কচলাতে কচলাতে গুপ্তা সাহেব বললেন, 'আরে ভাই, বাবুলোককে লিয়ে থোড়া মেঠাই আউর চায়েকা বন্দোবস্ত করো— ।'

'জি, জরুর' বলে রামভাইয়া চলে গেল।

ফের মশলা মুখে পুরে গুপ্তা সাহেব বলেলেন, 'আপনি সেই ঘোস্ট কোঠির কথা বলসেন তো ?

'ভূতের বাড়ি কিনা জানিনা তবে মৃগনাভির সেই বাড়িটা সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাই।'

'উ আর কি জানবেন—একদম খতরনক বাড়ি আছে। উতো বড়ো বাড়ি দেখিয়ে হামার বহুৎ লোভ হইয়েছিল। আউর সওদা কি বহুৎ কোম ছিল। তো হামি ভাবলাম দাঁও বহুৎ আচ্ছা আছে। কিনিয়ে নিলাম।'

'তা কলকাতা শহর ছেড়ে অতদূরে বাড়ি কিনতে গেলেন কেন ?'

'বদনসীব বাবুজী। ভাবছিলাম কি শহর কি বাহার কোই আপনো কোঠিউঠি থাকলে দুচার রোজ কি লিয়ে ইয়ার দোস্তদের সাথে খানাপিনা করা যাবে। তো—'

'কেনার আগে আপনি এই ভূতটুতের ব্যাপার কিছু শোনেন নি ?'

'থোড়া থোড়া শুনিয়েছিল। লেকিন হামি কোন মাইণ্ড করে নাই। ভাবছিলাম কি কোই খতরনাক আদমীর চাল আছে।'

'তারপর কি হল ?'

'কোঠিটা হামার বহুত পসন্দ হইয়েছিলা তো, কোঠিটা পারচেজ করার পর আচ্ছাসে রিনোভোট করিয়ে এক সাটারডে হামার কিছু জিগরি দোস্তদের সাথে খানাপিনা করতে গেলাম ঐ কোঠিমে। তো হামি কি বলবে বাবুজী। সেই এক রোজকে লিয়েই হামি ঐ কোঠিতে রাত কাটিয়েছে—ব্যস্, আউর কোই দিন হামি যায় নাই।'

'কেন ?'

'ঘোস্টকে লিয়ে !'

'আপনি ভুত দেখেছিলেন ?'

'হাঁ হাঁ, জরুর—রাতমে যখন বহুৎ পিনা হয়ে গেলো, দিলমে যখন বহুৎ মনপসন্দ কি গীত আসতে লাগল তোখন, সাচ্ বলছে বাবুজী, এক খুবসুরত লেড়কী হামাদের সামনে এসে দাঁড়ালো।'

'লেড়কী ? মানে নর্তকী ?'

'হাঁ হাঁ নর্তকী।'

'আপনারা কি নাচগানের জন্য কাউকে নিয়ে গিয়েছিলেন ?'

'নেহি, বিলকুল নেহি। নর্তকীসে হামার বহুত নফরৎ আছে। হামি একদম পসন্দ করে না।'

'তারপর ?'

'তো হামলোগ বুর্বাক বনে গেলো। এ লেড়কী এলো কুথা থেকে ? হামার ইয়ার দোস্তরা বহুৎ মজা পেয়ে গেলো। লেকিন হামার মন কুছুতে মানতে চাইল না। ভাবলাম, ই কেমন করে হয় ? হামি তো কোই লেড়কীকে বোলেনি। আওর নেশা ভি যয়দা করেনি। তব্ ? তোখন হামার মাথায় একটা পেলান আসল। ভাবলাম কি এই লেড়কীকে পাকড়াও করতে হোবে। বিলকুল এ কোই দুশমনের কাম কাজ আছে। এ লেড়কীকে পাকড়াও করলে আসলি টুথ বেরিয়ে আসবে। তো হামি করল কি, কাউকে কুছ না বলে ভেরী শ্লোলি লেড়কীর পিছু গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর—

'থামলেন কেন ? বলুন—'

'আচানক্ পিসন দিক্‌সে লেড়কীকে জোড়সে পাকড়াও করে ফেললাম।'

'ধরলেন মেয়েটাকে?'

হঠাৎ দেখলাম গুপ্তা সাহেবের ছোট ছোট গোলাকার দুটো চোখ কেমন যেন অতীতের সেই রাতের মধ্যে ফিরে গেছে। তারপর প্রায় মৃদুস্বরে বললেন, 'নেহি বাবুজী। আজতক্ হামি সেই কুথা মালুম করলে, হামার ডর লাগে। হামি যখন ভাবলাম লেড়কীকে অ্যারেস্ট করিয়েসে—তোখন দেখি কি লেড়কী হামার কাছ থেকে বহুৎ দূর চলিয়ে গেছে! হামি বিলকুল এয়ার পাকড়েছে আউর লেড়কী থোড়া দূর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোর তুলে হাসছে। তো হামার জেদ চাপিয়ে গেলো। হামি ছুটে গেলাম ওকে ফিন্ পাকড়াবার জন্যে। লেকিন ফিন হাওয়া হইয়ে গেলো।'

'কিন্তু এগুলো তো আপনার হ্যালুসিনেশনও হতে পারে?'

'তো ওহি তো হামি বল্‌সে। ইয়ে চক্কর ভি হো সোকতা। লেকিন হামি যোখন তাকে পাকড়াও করতে পারলাম তোখন দেখি কি ও লেড়কি নেই, সিরিফ এক স্কেলিটান। ফুল ইউম্যান স্কেলিটান।'

'আশ্চর্য। তারপর?'

'তো হামি যোখন কিছুতেই তাকে ছাড়বে না তোখন উয়ো গোস্ট্ আমাকে হিট্ করতে লাগল। হামার বুকে বহুৎ জোর জোর ঘুষি মারল। উস্‌কি বাদ হামার আর কুছ জ্ঞান ছিল না?'

'আর আপনার বন্ধুরা?'

'উ সোব আদমী তো পহেলেই বেহুঁশ হয়ে গিসল। যোখন আমার সেন্স ফিরে এলো দেখলো কি হামি হামার কলকাতার কোঠিতে শুয়ে আছে। আউর বহুৎ জানপয়ছান আদমী হামার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। হামার বিবিজী বহুৎ কাঁদছে।'

'কেন?'

'উস্ রাতমে হামার বহুৎ ব্লিডিং হয়েছিল।'

'বাড়িটা কি তারপরই বিক্রি করে দিলেন?'

'হু পারচেজ? নও বরষ হামাকে ওয়েট করতে হইয়েছিল। নও বরষ পর এক বঙ্গালী বাবুকে বহুৎ কমডাঁওসে বিক্রি করেছে। বাস্।'

'বাস্' বলেই চন্দ্রভূষণবাবু গল্প শেষ করলেন। এদিকে রামভাইয়াও গরম গরম সামোসা আর লাড্ডু এনে হাজির করল। সঙ্গে চা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখন প্রায় সাতটা। গুপ্তাসাহেব আর একবার রিকোয়েস্ট করতেই আমরা আহারের সদ্‌ব্যবহার শুরু করে দিলাম। সামোসা আর লাড্ডুগুলো খিদের মুখে বেশ জম্পেস হয়ে উঠল। সঙ্গে মশ্‌লা দেওয়া

চা। খেতে খেতে নীল আরো দু' একটা প্রশ্ন করল।

'আচ্ছা গুপ্তাসাহেব, বাড়িটা আপনি কার কাছ থেকে কিনেছিলেন, মনে আছে?'

'আসে। এক ঝড়্‌তিপড়্‌তি জমিন্দারের কাছ থেকে।'

'কি নাম তাঁর?'

'রামমানিকবাবু।'

'ঠিকানাটা পাওয়া যাবে?'

'এখনি দিতে পারবে না। লেকিন মালুম হচ্ছে কি কালেক্ট করে দিতে পারবে।'

'কবে আসব?'

'উস্‌কি পহেলে হামার একটা প্রশ্ন আছে।'

'বলুন।'

'হামি এতোদিন জানতাম কি চোরি আর খুনকে লিয়ে জাসুস আদমীর দোরকার পড়ে। লেকিন ঘোস্ট কি লিয়ে এক জাসুস কি কেয়া জরুরৎ—?'

'আনফরচুনেট্‌লি কেসটা আমার হাতে এসে পড়েছে।'

আমাদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর দু-একটা মামুলী কথার পর বেরিয়ে পড়লাম। ওঁনার সঙ্গে কথা হল দু-এক দিনের মধ্যেই গুপ্তাসাহেব ফোনে নীলকে রামমাণিক্যবাবুর ঠিকানাটা জানিয়ে দেবেন—'

দিন দুয়েক পরই হেমন্তের অসময়ের বৃষ্টিটা একদম চলে গেল। আকাশটা দিব্যি ঝলমলে আলোয় হেসে উঠল। কাঁচা গলানো সোনার মত রঙ। বৃষ্টির পর রোদটা এইরকমই হয়।

হাওড়া স্টেশনে আমরা তিনজন যখন এসে পেঁাছলাম বড় ঘড়িতে তখন পৌনে ন'টা। নীল আমাদের ঘড়ির নীচে দাঁড়াতে বলে টিকিট কাটতে চলে গেল। হাওড়া থেকে পলাশমায়ার ট্রেন অনেক। ইচ্ছে করেই ও ন'টা পনেরোর ট্রেনটা ধরতে চায়। পেঁাছতে তো বেশী সময় লাগবে না।

গাড়িতে উঠে তাতন প্রথমেই একটা জানলার ধারে ওর জায়গাটা বেছে

নিল। ঠিক তিন মিনিট পর ই'লেকট্রিক হুইসেল দিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিল।

একটু পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে নীল স্টেট্‌স্‌ম্যানটা খুলতে খুলতে বলল 'একটা খোঁড়া লোক। লোকটা সত্যি খোঁড়া কিনা বোঝা গেল না। কারণ দুটো পাই আছে। সিঙ্গল ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটে। গায়ে পাওয়ারলুমের পাঞ্জাবী। রঙটা ফিকে গেরুয়া। পরনে পায়জামা। পায়ে চটি। কাঁধে ঝোলা। সব মিলিয়ে এত সিম্পল যে নজরেই আসে না। অথচ সমানে ফলো করে আসছে। লক্ষ্য করেছিস?'

আমি উত্তর দেবার আগেই তাতন বলে উঠল, 'চোখে কালো চশমা আছে। চশমাটা কমদামী। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই একই স্টপেজ থেকে উঠেছে। ঘন গোঁফ দাড়ি আছে। চুলগুলো এলোমেলো।'

'তাহলে তুই-ও লক্ষ্য করেছিলি?'

'লোকটা আমাদের ফলো করছে এতটা বুঝিনি তবে ওকে তোলার জন্যে 'এল ফোর' একটু সময় নিয়ে ছেড়েছিল, তাই লোকটাকে ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম।'

'গুড। কিন্তু ফলো করছে এটা বোঝা উচিত ছিল।'

'কেন?'

'চোখে কালো চশমা থাকলেও কাঁচটা হাল্কা সেডের। তাই চোখের মুভমেণ্টটা বোঝা যাচ্ছিল। ওর সর্বদা তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল আমাদের ওপর। এমন কি কনডাক্টর দুবার ভাড়া চাইবার পর চমক কাটিয়ে তবে ভাড়া দিল। কোথায় টিকিট হবে সেটাও ঠিক মত না বলে বলেছিল, 'ঐ একটা দিন না হাওড়া পর্যন্ত।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'সামান্য এই কারণে বুঝে নিতে হবে যে লোকটার উদ্দেশ্য খারাপ? আমাদের ফলো করছে? লোকটা হয়তো ভাবুক বা অন্যমনস্ক গোছের হবে?'

নীল বলল, 'কেবল ঐটুকু হলে আমিও অবশ্য তোর মত ভাবতাম লোকটার কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু উদ্দেশ্য কি সত্যই নেই?'

'তার মানে?'

'তোর ডানদিকের সাইড পকেটে একবার হাতটা ঢোকা'।

নির্বোধের মত নিজের ডান পকেটে হাত ঢোকালাম। ফাঁকা হাত বার করে নিয়ে এসে বললাম, 'কই কিছুই তো নেই!'

'আছে। আবার দেখ। ভালো করে দেখ।'

ভালো করে দেখে কিছু খুচরো পয়সা আর একটা বাসের টিকিট ছাড়া কিছুই পেলাম না। হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললাম, 'এইতো দেখ্‌না,

কটা পয়সা আর পুরনো একটা টিকিট ছাড়া—'

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই নীল বলল, 'টিকিটটা কোথা থেকে এল ? আসবার সময় টিকিট কি তুই নিয়েছিলি ?'

সত্যি কথা। টিকিট তো নীল কেটেছিল। তাহলে বাসের টিকিট আসবে কোথা থেকে ? এমন নয় যে পাঞ্জাবীটা দুচার দিন পড়ছি। বেরুবার সময় সকালে ভেঙেছি। কোনমতেই আমার পকেটে টিকিট আসার কথা না। বোকার মত আমি যখন নীলের দিকে তাকিয়ে আছি ও তখনি বলে উঠল, 'দেখতো টিকিটের পেছন দিকে কিছু লেখা আছে কিনা ?'

উল্টো দেখলাম। হ্যাঁ, লেখা আছে 'বাউণ্ডুলে 'ইঁদুর মরে, জাঁতাকলের হাতায় পড়ে।'

'বাঃ, এ তো একটা ছড়ারে। কি ব্যাপার বলত ?'

'ব্যাপার আছে। সর্বদাই বলেছি চোখ কান একটু খোলা রাখবি। ওটা সজাগ থাকলে বুঝতে পারতিস কেমন করে টিকিটটা তোর পকেটে এল। তাতন, তোর কিন্তু এটা নজরে আসা উচিত ছিল।'

কান চুলকে তাতন বলল, 'সরি কাকু। একদম মিস্। কিন্তু এ তো রীতিমত ধমকানি বলে মনে হচ্ছে।'

আমার হাত থেকে টিকিটটা নিয়ে ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। একবার শুঁকল। তারপর ধীরে ধীরে সেটিকে সযত্নে নিজের পার্স-এ রাখতে রাখতে নীল বলল, 'নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কি বলতে চায় ? জাঁতাকলের আওতায় গেলে বাউণ্ডুলে ইঁদুর মারা পড়বে। সে তো পড়বেই। কিন্তু অন্তর্নিহিত মানেটা কি ?'

ফস্ করে তাতন বলে উঠল, 'আমি বলব ?'

'বল্।'

'আমরা হচ্ছি বাউণ্ডুলে ইঁদুর। আর যেখানে যাচ্ছি সেটা হল জাঁতাকল। তাইত ?'

'ইয়েস। এবং সেখানে গেলে আমরা নির্ঘাত মারা পড়ব। অর্থাৎ, অদৃশ্য সংকেত, তোমরা মানে মানে ভালো ছেলের মত ঘরে ফিরে যাও।'

তাতন বলল, 'অর্থাৎ, রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে।'

রহস্য টহস্যের ব্যাপার শুনে এই সকলের ট্রেনের কামরায় বসেও আমার গাটা একটু শিরশির করে উঠল। তবে কি সত্যই আমরা কোনও চক্রান্তের মধ্যে নিজেদের অজান্তে জড়িয়ে পড়ছি ? কে জানে ? তাই নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু রহস্যটা কি ? এরকম হেঁয়ালী মার্কা ভাষায় সাবধান করারই বা কি উদ্দেশ্য ! অনাদিবাবু আর চন্দ্রভূষণবাবুর মুখ থেকে যা শুনেছি তাতে তো

ভূতপ্রেতের ব্যাপার বলেই মনে হয়। ভূতে এরকম রহস্যময় চিরকুট পাঠাবে?'

নীল মুচকী হেসে বলল, 'একি আর তোর চতুর্দশ শতাব্দীর ভূত! এ হল মডার্ন ভূত। এরা যে কতকি পারে তোর ধারণায় নেই।'

বুঝলাম নীল ঠাট্টা করছে। তবে এটুকু বুঝলাম ভূতই হোক আর মানুষই হোক ও বাড়িতে আমাদের যাওয়াটা কারো অপছন্দের ব্যাপার। তাই সে আগেভাগে যেতে নিষেধ করছে।

এ প্রসঙ্গে নীলকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। করলেও ঠিক উত্তর

পাওয়া যেতো না। তাতনও দেখলাম ভুরুটুরু কুঁচকে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে।

অনাদিবাবু বলেছিলেন পলাশমায়ায় পেঁছতে দু ঘন্টা লাগবে। খানিকটা বেশীই লাগল। বোধ হয় ট্রেন লেট রান করছে। ঠিক এগারটা উনিশে পলাশমায়ায় এসে গাড়ি থামল। এক মিনিটের জন্যে। আমরা নেমে পড়লাম। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নীল বলল, 'ভেবেছিলাম আমাদের আসার আসল উদ্দেশ্যটা জানাবো না। কিন্তু ভুতেশ্বরবাবু আগেই টের পেয়ে গেলেন। আর পাবে নাই বা কেন। ভুতযে অন্তর্যামী। ওঁরা আগে ভাগে সব টের পান। জয় ভুতেশ্বর কি জয়।'

বলেই ও হাত তুলে সামনের দিকে নমস্কার করল।

ওর এই ধরনের রসিকতায় আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, অনাদিবাবু হনহন করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। নমস্কারটা ওরই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি।

অনাদিবাবু কাছে এসে বললেন, 'রাস্তায় কোন কষ্ট টষ্ট হয়নি তো ?

'কিসের কষ্ট ? এই তো এইটুকু পথ। দিব্যি বসে বসে চলে এলাম।'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'কিন্তু একটা টিকিট—'

বলাটা শেষ হল না। ঠাস্ করে ঘাড়ে এক থাপ্পড় খেলাম।

নীল বলছে; 'আজকাল বড় 'এনকেফেলাইটিস্' হচ্ছে। মশাটা তাড়িয়ে দিলাম। আচ্ছা অনাদিবাবু, এদিকে মশাটশা কি রকম ?'

'আছে। তবে মশার অরিও আমার স্টকে আছে। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। এখন চলুন। রোদ চড়ে যাচ্ছে।'

লোহার ওভারব্রীজ পার হয়ে আমরা স্টেশনের পূর্বদিকে চলে এলাম। স্টেশন পার হয়ে নীচে নেমে এসে দেখলাম দুটো সাইকেল রিক্সা স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছে। বোধ হয় আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। অনাদিবাবুকে দেখে ওরা এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

তাতন আর অনাদিবাবু একটায় উঠে গেল। পিছনের রিক্সায় আমি আর নীল।

ঘাড়টা তখনও চিন্‌চিন্ করছিল। আগের গাড়িটা খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'দুম করে অত জোরে থাপ্পর কষালি কেন ? হাত নাড়লেই তো মশাটা পালাতো।'

নীল হেসে বলল, 'আদপেই মশাটশা ছিল না।'

'তাহলে ? ও বুঝেছি। অনাদিবাবুর সামনে বলাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু অনাদি বাবু তো—'

'অনাদিবাবুর কতটুকু তুই জানিস? একদিন দেখেই কি মানুষ চেনা যায়

'কিন্তু অনাদিবাবুই তো' আমাদের ইনভাইট করে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'তাতে কি হল ? এটা যে অনাদিবাবুর চাল নয় তা বুঝলি কেমন করে ?'

'তুই বলছিস সমস্তটাই বানানো গল্প ? তাহলে চন্দ্রভূষণবাবু ? উনিও কি বানিয়ে গল্প বললেন ?'

'সে সব এখন কিছুই বলতে পারছি না। তবে যেখানে সেখানে বেফাঁস কিছু বলবি না।'

সামনে অনাদিবাবুর রিক্সাটা পাকা রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের কাঁচা রাস্তায় নেমে গেল। আমাদের রিক্সাটাও ওদের অনুসরণ করে চলল।

প্রায় মিনিট পঁচিশ যাবার পর হঠাৎ শুনলাম সামনের গাড়ি থেকে অনাদি-বাবু চেঁচিয়ে বলছেন, 'এসে গেছি। ঐ সামনেই আমাদের বাড়ি।'

বলতে বলতে সামনের গাড়িটা বাঁ দিকে বাঁক নিল। আমাদের গাড়িটা ঘুরতেই দেখলাম সামনে বিস্তীর্ণ বাঁশবন। বাঁশবনের শেষেই ঘন জংগলের মাথা ছাড়িয়ে একটা বিরাট অট্টালিকার ছাদ দেখা যাচ্ছে। ঠিক এখান থেকে জ্যোৎস্না রাতে বাড়িটাকে দেখলে নির্ঘাৎ হানাবাড়ি বলেই মনে হবে। অনাদি-বাবুর কথামতো ওটাই এখানকার বিখ্যাত 'মল্লিক ভবন'।

হঠাৎ নীল রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা কর্তা তোমাদের এদিকে ভূতের বাড়ি কোন্‌টা ?'

গাড়ি চালাতে চালাতেই লোকটা বলল, 'আজ্ঞে বাবু, আপনারা যে বাড়িতে উঠতে চলেছেন সেটাই নাকি ভূতের বাড়ি।'

'নাকি' বলছ কেন ?'

'লোকে বলে তাই বলছি।'

'তুমি কোনদিন ভূত দেখোনি ?'

'আজ্ঞে না বাবু। আমার চোখে তেমন কোনদিন কিছু পড়ে নি তবে'—

'থামলে কেন ?'

'আমার দাদা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে।'

'স্বচক্ষে ? কি দেখেছে ?'

'সারা গায়ে আগুন লাগিয়ে একজন বৌ মতন মেয়েছেলে রাতবিরেতে ছাদের পাঁচিল ধরে দৌড়ুতে দৌড়ুতে নীচে ঝাঁপ দিয়েছিল। তা ও বাড়িতে তো সেদিন কোন লোকজনই ছিল না। বৌ আসবে কোত্থেকে ? পরদিন সকালেও কাছাকাছি কারো মরার খবর পাইনি। আশপাশের কেউ সে রাত্রে আত্মহত্যা করেনি সে তো সবাই জানে—।'

'তা এটা ভূতের কাজ তোমায় কে বলল ?'

'গাঁ সুদ্ধ সবাই। ঐ জন্যেই আগে কেউ দিনমানেই ও চত্বরে যেত নি। তবে এই বাবুরা আসার পর দেখি এখন তো সবাই যাচ্ছে।'

'এখন আর কোন ভূতের উপদ্রব নেই ?'

'না বাবু। আর তো কিছু শোনা যায় না। তা বাবু আপনারা কি এখানে বেড়াতে এয়েছেন ?'

'হ্যাঁ'

নীল আর কথা বাড়ালো না। দেখতে দেখতে বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেমে গেল।

বাড়িটা যে একেবারে গ্রামের শেষ প্রান্তে সেটা বেশ বোঝা যায়। প্রায় মাইল খানেক একপাশে জলা জমি অন্যদিকে বাঁশবন। মধ্যে সরু রাস্তা পার হয়ে এখানে পোঁছলাম। এখানেও ঘন জঙ্গল ছাড়া চারপাশে আর কিছু নজরে এল না। মল্লিক বাড়িতে ঢোকার আগে বড় কাঠের দরজা। দরজার মাথায় লোহার তীর বসানো রয়েছে।

অনাদিবাবু এগিয়ে গিয়ে চাবি দিয়ে সেই বড় কাঠের দরজার লাগোয়া মাথা নীচু করে ঢুকতে হয় এমন ছোট দরজার তালা খুলে ফেললেন। তারপর আমাদের দাঁড়াতে বলে একাই ছোট দরজাটা দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। খট্ করে একটা আওয়াজ হল। ধীরে ধীরে বড় কাঠের দরজাটা খুলে গেল।

দুপাশে নানান ধরনের ফুলের বাগান। হরেক রকমের ফুল ফুটে রয়েছে। লাল কাঁকড় বেছানো সরু পথটা ভেতর দিকে চলে গেছে।

একটুখানি গিয়ে রাস্তার বাঁপাশে একটা বড় পুকুর। পুকুরের ধারে বেশ পানা আর ময়লা জমেছে। জলটাও কিঞ্চিৎ ঘোলাটে।

তিনজনেই আমরা দেখতে দেখতে চলেছি। হঠাৎ নীল জিজ্ঞাসা করল, 'পুকুরে মাছ কেমন ?'

'আছে। তবে তেমন ধরাটরা হয় না। প্রাণী তো আমরা এই কজন। কে খাবে ?'

'কোনদিন ধরেছেন।'

'একবার। সেই গৃহপ্রবেশের সময়। তবে শম্ভু মাঝে মাঝে সকালের দিকে

ছিপ টিপ ফেলে। সের খানেকের বেশী কোন দিনও তুলতে দেখি নি।

'আর এই ফুলের বাগান ?'

'ওটা আমারই করা। সারা দিন তো ঐ সব নিয়েই থাকি।'

'জন্তু জানোয়ারের তেমন শখ নেই ?'

'জন্তু জানোয়ার মানে ?'

'এই কুকুর বেড়াল। এই সব আর কি !'

'আপনাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। কুকুরের শখ আমার বহু দিনের। পশ্চিমে থাকতে আমার দুটো ভালো জাতের কুকুর ছিল। একটা ওখানেই মরে গিয়েছিল। একটাকে সঙ্গে এনেছি।'

'কি কুকুর ?'

'পিওর অ্যালসেসিয়ান।'

'আশ্চর্য।'

'কেন ? এতে আশ্চর্যের কি হল ?'

'এইসব প্রাণীট্রানীরা শুনেছি স্পিরিটের উপস্থিতি নাকি আগেই টের পায়। অথচ আপনার কুকুর কোন সাড়াশব্দই করল না।'

'রাত্রে তো ও আমার ঘরে থাকে না। ওর আলাদা ঘর আছে। সেখানেই থাকে।'

'হুঁ', বলে নীল চুপ করে গেল। কথা বলতে বলতে আমরা গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালাম।

বাড়িটা বেশ পুরনো। অনাদিবাবুর হিসেবমত প্রায় দেড়শ বছর বয়েস। বাড়ির থাম, খিলান, সিঁড়ি এসবের মধ্যেও পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু বাড়িটা পুরনো হলেও যে রকম জরাজীর্ণ হবার কথা তেমন না। মোটামুটি নতুন সিমেন্টের প্লাস্টারিং আর রঙটঙ করা। গত বর্ষায় যেটুকু ধুয়ে গেছে তার বেশী কিছু না।

পুরনো জমিদারের বাড়ি বলেই বোধ হয় সাদা আর কালো মার্বেলের ব্যবহারটা বেশীই নজরে পড়ল। গাড়ি বারান্দার নীচে মেজেটা সাদা কালো চৌকো মার্বেলের। ঢোকার মুখে দুটো বড় বড় সোনালী পাথরের সিংহ। সিংহ দুটো যেন ঝকঝক করছে। মনে হয় রোজই এগুলো ধোয়ামোছা হয়। সিংহ দুটোর ঠিক দুপাশেই শ্বেত পাথরের দুটো বড় রোয়াক।

গাড়িবারান্দাটা বেশ লম্বা। আগাগোড়া শ্বেত পাথরে মোড়া। তিন চার হাত দূরে দূরে গোটা বারান্দাটা জুড়ে কাজ করা শ্বেত পাথরের কোমর পর্যন্ত উঁচু থাম। আর তার ওপর ঐ শ্বেত পাথরেরই বড় টব। টবগুলোয় নানা রকমের লাল হলুদ ফুল ফুটে রয়েছে।

লম্বা বারান্দার ঠিক মধ্যিখানে কালো পাথরের একটা বেদী রয়েছে। সেখানে গোল টবে ফুলগাছ। নীল বেদীটা ভালো করে দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, 'এই বেদীটার ওপর এই ফুলের টবটা কি বরাবরই ছিল ?'

'আজ্ঞে না। ওখানে রাজস্থানের সোনালী পাথরের তৈরী সুন্দর একটা বুদ্ধমূর্তি ছিল। জিনিসটা দেখতে দারুণ। বাইরে পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাই ওখান থেকে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে রেখে দিয়েছি। বাগানের মধ্যেও এই রকম সোনালী আর সাদা পাথরের অনেক পরীটরী আছে। এগুলো বলতে পারেন উপরি পাওনা।'

কথা বলতে বলতে আমরা বড় দরজার সামনে এসে পড়লাম। দু ধাপ শ্বেত পাথরের সিঁড়ি পেরিয়ে বড় মেহগিনি কাঠের দরজা। দরজায় পিতলের কড়া। কড়া নাড়তেই একজন লোক এসে দরজাটা খুলে দিয়ে অনাদিবাবুকে দেখে ভেতরে চলে গেল। বুঝলাম এই লোকটাই শম্ভু।

ভেতরে গিয়ে একটু অবাক হতে হল। বাইরের থেকেও ভেতরটা অনেক বেশী ঝকঝকে তকতকে। আর সাজানো গোছানো। হাবিজাবি আসবাবপত্রের তেমন ভিড় নেই। দেওয়ালে বিদেশী অয়েল পেণ্টিংসএর প্রিণ্ট সুন্দর ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো। একটু উঁচুতে একটা বড় দেওয়াল খড়ি। অন্যদিকে হরিণের মাথা।

একটা অদ্ভুত জিনিস নজরে পড়ল। দেশ পাড়াগাঁয়ে এটাই বিশেষত্ব কিনা জানিনা। বড় হলঘরটার চার কোণে চারটে সাধারণ কাঠের বাক্স পাতা রয়েছে। সেগুলো ঘিরে অজস্র মৌমাছি বনবন করছে।

তাতনের নজরে পড়েছিল। ও জিজ্ঞাসা করল, 'জেঠু, এগুলো কিসের বাক্স ?'

'মৌচাক। মধুর চাষ করছি। এও এক ধরনের মধু কালেক্ট করার পদ্ধতি।'

'তাহলে তো তোমরা রোজই মধু খাও।'

'তোকেও খাওয়াব। টেস্ট করলেই বুঝতে পারবি তোদের শহরে যে মধু বিক্রি হয় তার সঙ্গে এর টেস্টের কত তফাৎ।'

বড় হল ঘরটার পূর্বদিকে আর একটা বড় ঘর। অনাদিবাবু বললেন ওটা বৈঠকখানা। উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিলাম। মধ্যিখানে শ্বেত পাথরের সেণ্টার ওভালসেপের টেবিল পাতা রয়েছে। চারপাশে অনেকগুলো সাবেকী চেয়ার। নতুন করে পালিশ করা হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়। অনেকগুলো দেওয়াল আলমারির রয়েছে। সেগুলো বন্ধ। এ ঘরের দেওয়ালে ছবি টাঙানো আছে। ঠিক উল্টো দিকে অর্থাৎ হলঘরটার পশ্চিমে মাঝারি মাপের আর একখানা ঘর। এ ঘরে বিশেষ তেমন আসবাব নেই। তবে এ ঘরটারও চার-

কোণে ঐ রকম চারটে কাঠের বাক্সের মৌচাক রয়েছে। যথারীতি মৌমাছি ঘুরছে। কোনটায় বেশী। কোনটায় কম। ঘরের মধ্যিখানে লম্বা আধুনিক স্টাইলের ডাইনিং টেবিল পাতা রয়েছে। ওটা দেখিয়ে অনাদিবাবু বললেন, 'বাড়ি কেনার সূত্রে বাড়ির সঙ্গে অনেক পুরনো আমলের আসবাবপত্র পেয়েছি। তবে ঐ টেবিলটা আমার কেনা। পুরনো ফার্ণিচারের দোকানে সাবেকী কিছু পেলাম না। একটু বেমানান হয়েছে। কি আর করা ?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনারা কি নীচেই খাওয়া দাওয়া করেন ?'

'না ভাই। ওটা অতিথি অভ্যাগতের জন্যে। অবশ্য ব্যবহার কমই হয়।'

ডাইনিংরুম পার হয়ে একটু উঠোনের মত জায়গা। উঠোনের একপাশে ভালো বিলিতি কাঠের ছোট্ট একটা ঘর। ঘরের দরজাটা ভেজানো। অনাদিবাবু জানালেন ওটা টমির ঘর।

উঠোনের অন্য দিকে পাশাপাশি দু'খানা ছোট ঘর। একটা ঘর খোলাই ছিল। উঁকি দিয়ে দেখলাম দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। খাট বিছানা কিছু নেই। ঘরের এক কোণে একটা শতরঞ্চি মোড়া বালিশ। এক দেওয়াল থেকে আর এক দেওয়াল পর্যন্ত একটা দড়ি খাটানো। কয়েকটা ধুতি আর ফতুয়া ঝুলছে।

তাতন প্রশ্ন করল, 'এ ঘরে কে থাকে জেঠু ?'

'শম্ভু। আর ঐ যে পাশের ঘরটা দেখছিস ওটায় থাকে সুন্দরী আর ওর মা।'

'সুন্দরী কে জেঠু ?'

'যে চাষী বউ-এর কথা বলেছিলুম, সুন্দরী তারই মেয়ে।'

হঠাৎ মনে হল নীল অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে নেই। সত্যিই তাই। ও কখন যেন হলঘরটায় চলে গিয়েছিল। আমরা হল ঘরে ফিরে এসে দেখি একটা মৌচাকের কাছে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যেন দেখছে। তারপর বার তিনেক চাকটার চারপাশে ঘুরপাক খেল। সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকের বাক্স থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি বেরিয়ে আসতে শুরু করল।

অনাদিবাববু ত্বরিতে কাছে গিয়ে নীলকে টেনে নিয়ে বললেন, 'আরে করছেন কি মশাই ? মৌমাছি এমনিতে খুব শান্ত। ওদের না ঘাঁটালে কিছু করে না। কিন্তু কোন কারণে যদি বুঝতে পারে আপনি ওদের জমানো মধু চুরি করতে এসেছেন তাহলে কামড়ে আপনাকে ছিঁড়ে ফেলবে। তখন ছুটে পালিয়েও আপনি ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না।'

'আমিও তো তাই আন্দাজ করেছিলাম। পরীক্ষা করছিলাম প্রাণীগুলো কতটা নিরীহ আর সজাগ ?'

'আপনার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না ?'

'না, এমনি মনে এল তাই বললাম। চলুন এবার ওঘরে যাওয়া যাক। আপনারা তো ওপরেই থাকেন ?'

'হ্যাঁ চলুন।'

ঘর থেকে বেরুলেই মস্ত উঠোন।

উঠোনের ডানদিকে সিঁড়ি। সবাই আমরা ওপরে উঠে এলাম। সিঁড়ি শেষ হলে লম্বা বারান্দা। লাল মেঝে। বারান্দায় দাঁড়ালেই সামনে বাগান। আম জাম কাঁঠাল পিয়ারা, তেঁতুল আর বট অশত্থের ঘন জঙ্গল। বাগানের শেষ দেখা যাচ্ছে না। ঘনপাতার আড়ালের জন্যেই। অনাদিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম 'এ বাগানটাও আপনার ?'

'হ্যাঁ ভাই। বিরাট বাগান। নয় বিঘে সাড়ে চার কাঠা জায়গা নিয়ে বাগানটা।'

'ফলটল কেমন হয় ?

'দেদার। সব কালেক্ট করতে পারি না। পাড়ার বখাটে কিছু ছোকরা ফল পাকবার আগেই চুরি করে নেয়।'

'দারোয়ান রাখেন নি।'

'দারোয়ান ঠিক নয় মালি। রাধেশ্যাম। তবে ফলটল সাধারণত চুরি হয় রাত্রে। তখন ত' সে বাবু নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমবেন। কিছু বলতেও পারি না। হয়তো আর রাখা যাবে না—।

'কেন ?'

'লোকের ভয়টা অনেকখানি চলে গিয়েছিল। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে যেসব ব্যাপার স্যাপার ঘটছে সেগুলো শুনলে তো শম্ভুই হাওয়া হয়ে যাবে।'

নীল বলল, 'কাউকে যখন কিছু বলেন নি তখন আর কিছু বলারও দরকার নেই।'

বারান্দার উত্তরদিকে পর পর চারখানা ঘর। চারটেতেই তালা লাগানো। একেবারে শেষের ঘরটার তালা খুলে অনাদিবাবু ঘরে ঢুকলেন। পেছন পেছন আমরাও।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল তাতন নেই। সিঁড়িতে উঠে দোতলা পর্যন্ত ও আমাদের সঙ্গেই ছিল। কিন্তু এখন দেখছি না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাতন কোথায় গেল ? ওকে ত' দেখছি না।'

'তাইত' বলে অনাদিবাবু ফের বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে কয়েকবার তাতনের নাম ধরে ডাকলেন। একটু পরেই ছাদ থেকে তাতনের গলার আওয়াজ পেলাম, 'আমি ছাদে আছি, এক্ষুনি আসছি।'

'ছেলে ছোকরাদের কিউরিসিটি বড্ড বেশী। এসেই ছাদ দেখতে গেছে। কলকাতায় এত বড় ছাদ পেলে ঘুড়ি উড়িয়ে মজা পেতো। একি আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, বলে দুটো চেয়ার এগিয়ে দিলেন অনাদিবাবু।

বসতে বসতে নীল বলল, 'আপনাদের শম্ভুকে দেখছি না। সে কোথায়?'

'আছে, রান্নাঘরেই আছে। আপনারা একটু বিশ্রাম করুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি। চানটান করবেন তো?'

নীল বলল, 'না স্নান করেই এসেছি। একটু মুখহাত ধুতে হবে।' 'নিশ্চয়ই। তার আগে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিন।'

বলেই উনি পাখাটা চালিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় ওনার চটির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম, 'তাতন, নেবে আয় বাবা। রোদে থাকিস না। বড্ড রোদ। অসুখে পড়ে যাবি।'

চটির আওয়াজ ক্রমশ নীচের দিকে মিলিয়ে গেল।

দিনের আলোয় আমার কোথাও কোন ভৌতিক অস্বাভাবিকতা নজরে এল না। কিন্তু একটা জিনিষ দেখে আমি 'বাঃ' না বলে থাকতে পারলাম না। হরেক রকম রঙিন কাঁচের টুকরো দিয়ে তৈরী একখানা ছবি। আন্দাজ সাতফুট বাই বারফুট ত' হবেই। কাঁচগুলো সেড্ মিলিয়ে মিলিয়ে দেওয়ালের ওপরেই বসানো। আনমনে পুকুরের পাড়ে বসে রয়েছে শকুন্তলা। ঠিক পিছনেই, গাছ পালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুষ্মন্তের উৎসাহী মুখ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কাঁচ সাজিয়ে আর রঙ মিলিয়ে যে এমন সুন্দর একটা ছবি করা যায় আমি ভাবতে পারিনি।

নীলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সেও বিস্ময় আবিষ্ট চিত্তে এক মনে ছবিটা দেখছে। এই বিরাট শিল্প কর্মটিকে ঠিক কি আখ্যা দোব তা ভেবে পেলাম না। পেণ্টিংস? না ফ্রেসকো না শুধুই ছবি? তবে আজ এটা কিউরিওর পর্যায়ে পড়ে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ছবিটা তন্ময় হয়ে কতক্ষণ দেখছিলাম জানিনা। নীলের কথায় ধ্যান ভাঙ্গল, 'এটাও দারুণ।'

তাকিয়ে দেখি আমার ঠিক পেছনের দেওয়ালে ঐ ছবির মাপের একই প্যারালালে বিরাট একটা আয়না। আয়নার দু পাশে দু খানা বড় বড় জানলা। জানলা দিয়ে বাগানের সবুজ গাছের মাথা উঁকি দিচ্ছে।'

দৈর্ঘ্য প্রস্থে ঘরটা বিশাল বলা যায়। পনের ষোল ফিট উঁচুত' হবেই। জানলা দরজাগুলোও কিছু কম যায় না। জানলাই রয়েছে ছ'খানা। ঘরের স্কেচ্‌টা মোটামুটি এই রকম।

উত্তর দিকের দেওয়ালে দুখানা জানলা। মধ্যে একটা দরজা। দরজা খুলেই গাড়িবারান্দা। পূর্ব দিকেও দুখানা জানলা। জানলার ওপাশে বাগানের গাছ দেখা যাচ্ছে। দুই জানলার মধ্যে সেই বিরাট আয়নাটা। আমরা ঘরে ঢুকেছিলাম দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে। মাঝখানে দরজা রেখে এই দেওয়ালেও দুখানা জানলা দুপাশে। কেবল জানলা বা দরজা নেই পশ্চিমের দেওয়ালে। সেই দেওয়ালের মধ্যিখানে সেই বিরাট কাঁচের পেন্টিংস্' দুপাশে দুখানা বড় দেত্তয়াল আলমারি।

আগেকার দিনের জমিদারের বাড়ি বলেই বোধহয় ঘরটা যেমন উঁচু তেমনি দেওয়ালগলোও বেশ পুরু। ভেতরের দেওয়াল গুলো বিশ ইঞ্চি। বাইরের দিকে দুফুট ত' বটেই।

নেভি ব্লু কালারের ডিস্টেম্পার করা দেওয়াল। সিলিংটাও ঐ একই রঙের। সিলিংএ কিছু বিশেষত্ব দেখলাম। ঘরে পর্যাপ্ত আলো আসার জন্যে সিলিং-এ চৌকো গর্ত। গর্তটা ওপর দিকে খানিকটা উঠে গেছে। মাথাটা অনেকটা দূরে থেকে দেখা কুঁড়েঘরের চালার মত। কিন্তু সেটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা রয়েছে। এত জানলা দরজা থাকা সত্ত্বেও কেন যে এই ধরণের লাইট-পাসার ব্যবহার করা হয়েছে বুঝলাম না। ঘরের মেঝে থেকে কোমর সমান উঁচু দেওয়ালের গায়ে সবুজ সোনালী আর কমলা রঙের ফুলের নক্সা।

আসবাবপত্র অনাদিবাবুর বর্ণনা অনুযায়ী মিলে যাচ্ছে। বাঁদিকে বই রাখার আলমারি। সেখানে হরেকরকম রচনাবলী সাজানো রয়েছে। ডানদিকে জানলার ধারে স্টীলের আলমারি। আলমারির ঠিক পাশেই সেই সোনালী পাথরের ধ্যানাসনে বসা বুদ্ধের মূর্তি। মূর্তিটার জায়গায় জায়গায় চটে গিয়েছে। দেওয়ালে কয়েকজন মনীষীর ছবি। কর্তা-গিন্নীর অল্প বয়সের ছবিও টাঙ্গানো রয়েছে।

ঘরটা যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি অনাদিবাবু আর তাতন এসে ঘরে ঢুকল। অনাদিবাবুর পিছনে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা আর হাতকাটা আধময়লা ফতুয়া পরা একজন লোক হাতে ট্রে নিয়ে ঘরে এল। লোকটার বয়েস বছর ত্রিশ বত্রিশ হবে। এই লোকটাই শম্ভু। চা জলখাবার রেখে শম্ভু চলে গেল।

বিনা বাক্যব্যয়ে জলখাবারে মন দিলাম। একটা বিগ সাইজের রসগোল্লা মুখে পুরে নীল বলল, 'আচ্ছা অনাদিবাবু আপনার অ্যালসেসিয়ানটিকে ত' দেখতে পাচ্ছি না। গেল কোথা?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে অনাদিবাবু বললেন, 'মাসখানেক ধরে টমির যে কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। সময় নেই অসময় নেই কেবল ঘুমোয়।'

'ভারি আশ্চর্য ত ? রাত্রেও তাই ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত্রেও তেমন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।'

'তার মানে ঘুমোয়। অর্থাৎ চোরের পোয়াবারো।'

অনাদিবাবু কেমন যেন উদাস হয়ে বললেন, 'বুড়ো হলে বোধ হয় সবারই বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে। টমিরও প্রায় বারো বছর বয়স হল।'

কুকুর প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ টপ্‌কে গিয়ে নীল বলল, 'আচ্ছা অনাদিবাবু, এই বড় আয়নাটা কি আপনার কেনা ?'

'না। ওটা বলতে পারেন উপরি পাওনা। বাড়িটা কেনার সময় ওটা ওখানেই ছিল। চন্দ্রভূষণবাবু আয়নাটা আর নিয়ে যাননি।'

'সেকি ! আয়নাটার দামও ত' অনেক। চন্দ্রভূষণবাবু ব্যবসাদার লোক হয়েও—'

'ওনার স্ত্রীর বেজায় আপত্তি। এ বাড়ির কোন জিনিসই উনি হাত দিতে চাননি। এইসব আসবাব পত্রের মধ্যেও অশরীরী আত্মা-টাত্মা লুকিয়ে আছে এই রকমই নাকি ওঁর স্ত্রীর ধারনা। অবশ্য সামান্য কিছু দাম আমি ধরে দিয়েছিলুম।'

'আর এই রঙীন কাঁচের ছবিটা ?'

'ওটাত' বাড়িরই একটা অংশ। যেমন ঐ বুদ্ধের মূর্তি বা বাগানের অন্যান্য স্ট্যাচু। অবশ্য বাড়ির পূর্বতন মালিক ওগুলো আলাদাভাবে বিক্রী করে দিতে পারতেন। তা যখন করেন নি তখন বলতে পারেন বাড়িটার সঙ্গেই ওগুলো আমার হাতে এসেছে।'

'এছাড়া আর কিছু ?'

'তেমন কিছু না। বাড়িটা রিনোভেট করার সময় একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রুম বেরিয়ে পড়ে। তা সেখানেও খুব দামী কিছু ছিল না। সব ওয়েস্টেজ মেটিরিয়াল্‌স্‌।'

'কি রকম ?'

'ভাংগা ঝাড় লন্ঠন, ছেঁড়া আর দুমড়ানো অয়েল পেন্টিংস, মরচে ধরা হাতল নেই এমন একটা তলোয়ার, প্রাচীন কিছু পুঁথির ছিন্নাবশেষ, মদের গ্লাসের টুকরো অংশ আর কম সে কম লরিখানেক রাবিশ।'

'নীল রসিকতা করল কিনা জানিনা, ফস্‌ করে বলে উঠল, 'কোন কঙ্কাল-টঙ্কাল পাননি ?'

অনাদিবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'আপনি কি মীন করছেন বুঝতে পারছি না।'

'কিছুই মীন করিনি, তবে যেসব জিনিষের নাম করলেন ওগুলো

ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। তা ইতিহাস খুঁড়ে দু'একটা কঙ্কাল পাওয়া বিচিত্র না।'

'জোরে মাথা নেড়ে অনাদিবাবু বললেন, 'না মশাই, আমি কোন কঙ্কাল-টঙ্কাল পাইনি।'

এরপর আর তেমন কোন কথা হল না। অনাদিবাবু নীচে চলে গেলেন খাওয়ার তদারকি করতে। নীল আর একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঁচের ফ্রেমকোটা তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল। সত্যিই ওটা দেখার মত জিনিস।

খাওয়াটা খুব জম্পেস হল। এই বাজারেও অনাদিবাবু গলদা চিংড়ি যোগাড় করেছিলেন। নীল আর তাতন দুজনে পাল্লা দিয়ে চিংড়ির মালাইকারি আর মুর্গীর ঠ্যাং সাফ করে চলল। আমি পেট রোগা মানুষ।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে উঠতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। ইচ্ছে ছিল খাওয়ার পর সারা বাড়িটা ভালো করে একটু ঘুরে দেখব। কিন্তু খেয়ে উঠে অনাদিবাবু ঢেকুর তুলতে তুলতে বললেন, 'ব্যানার্জী সাহেব ভরপেট খাবার পর আমি আবার আধঘণ্টার মত না শুলে পেরে উঠি না।'

নীলও অত্যন্ত কম কথায় 'আমারও তাই' বলে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে চলে এল।

মুলবাড়ি থেকে একটু দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট একটা দুকামরার গেস্ট হাউস ছিল। ছোট্ট বাংলো টাইপের। অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ। একতলা বাড়িই বলা যায়। প্রথমটা অনাদিবাবু একটু ইতস্তত করেছিলেন। যতই হোক তাঁরই বিশেষ প্রয়োজনে আমরা এখানে এসেছি। কিন্তু গেস্ট হাউসটা দেখে নীলের খুব পছন্দ হয়ে যায়। অনাদিবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও ও এটাই বেছে নিয়েছে। তাতনও জেঠুর কাছে থাকতে চায় নি।

আসবাবপত্রের তেমন বাহুল্য নেই। নেয়ারের দুখানা খাট। বিজলীবাতি আর ফ্যানের ব্যবস্থাও আছে। জানলাগুলো বেশ বড়সড়। ছেলা বাঁশ আর দরমা দিয়ে পাল্লা তৈরী করা হয়েছে। দরকার মত সেট করে নেওয়া যায়। খান ছয়েক বেতের চেয়ার। বেতের সেণ্টার টেবিল, একটা ইজিচেয়ার। ঘরের দক্ষিণদিকে জানলা তুলে দিলে আমজামকাঁঠালের ঘন জঙ্গল। উত্তরের জানলা দিয়ে অনাদিবাবুর বাড়িটা আগাপাশতলা দেখা যায়।

জানিনা, হয়ত সেই জন্যেই নীল অত আগ্রহ করে গেস্ট হাউস পছন্দ করেছে।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিতে দিতে নীল বলল, 'শম্ভুর হাত ভাল। বেড়ে রাঁধে। এরকম রান্নার লোক পেলে কলকাতার অনেক গেরস্তই মাথায় করে রাখবে।

'তাতো বটেই' বলা ছাড়া এই কথার কোন লাগসই কিছু আমাদের কাছে ছিল না। আমি একটা নেয়ারের খাটে গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম। তাতন ওর ঝোলা থেকে হেমেন রায় রচনাবলীর ফাস্ট্ পার্ট্টা খুলে বসল। এখানে এসেই অনাদিবাবুর বই-এর আলমারি থেকে সেটিকে ও হস্তগত করেছে।

ভরপেট ভাত খাওয়ার পর আপনা থেকেই একটা আলসেমী আসে। আর শুলে তো কথাই নেই। দুচোখের পাতা আপনা থেকেই বুজে আসে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ তাতনের ঠেলাঠেলিতে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, 'জয়কাকু তোমার চা রেডি।'

চোখ খুলতেই জানলা দিয়ে দক্ষিণের বাগানটা চোখে পড়ল। হেমন্তের শেষ বিকেল গাছেদের গায়ে অন্ধকারের ছায়া ফেলেছে। পাখিগুলো কিচির-মিচির করতে করতে যে যার ঘরে ফিরে আসছে। নীলকে দেখতে পেলাম না। ওর কথা জিজ্ঞাসা করায় তাতন বলল অনাদি জেঠুর সঙ্গে বাগানে ঘুরছে।

চা-টা শেষ করেই আমি আর তাতন বেড়িয়ে পড়লাম। আপাতত কোথাও যাবার নেই। মল্লিকভবনটাও ভাল করে দেখা হয়নি। দুজনে পুবদিকের বাগান ভেঙ্গে এগিয়ে চললাম। সরুপথের দুপাশে কিছুদূর অন্তর শ্বেত-পাথরের পরী বা ফুলের কাজ করা টব বসানো রয়েছে। তবে মূর্তিগুলো এখন আর অক্ষত নেই। কারো হাত নেই, কারো পা নেই, কারো বা মুখই উড়ে গেছে।

অনাদিবাবু ঠিকই বলেছিলেন। বাগানটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বাড়িটাকে মধ্যিখানে রেখে গোটা বাগানের পরিধি বেশ কয়েক বিঘা। বেশীর ভাগই ফলের বাগানে ভরা। আমজাম সুপারি আর কাঁঠাল গাছ। বট অশত্থও আছে। গাছগাছড়া এত বেশী যে জঙ্গল বললেও ভুল হয় না।

কিছুদূর যেতেই বাঁপাশে পড়ল একটা পুকুর। মাছটাছ আছে কিনা জানা গেল না। কেননা সন্ধ্যেবেলা সব পুকুরই সমান।

অন্যমনস্কের মত চলছিলাম। বাতাসে বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব আছে। অসময়ে খাওয়া। দুপুরে খানিকটা ঘুম। বেড়াতে ভালোই লাগছিল। হঠাৎ তাতন আমার বাঁ হাতটা চেপে ধরে একটু টান দিল, 'জয়কাকু—দেখ দেখ ঐ সামনের মাঠটায়।'

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি বাগানের শেষে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। যদিও স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না তবু জায়গাটা ফাঁকাই। যেন হঠাৎ জঙ্গলটা শেষ হয়ে গেছে।

আবছা আলো আর অন্ধকারে স্পষ্ট দেখলাম লম্বা আলখাল্লা পরা একজন সাধুমত লোক লাঠির ওপর ভর দিয়ে পশ্চিমের ঘন জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছে। যেটুকু আলো আছে তাতে মনে হল ওদিকটায় ঘন বাঁশবন।

তাতন আমি দুজনেই দুজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। তাতন বলে উঠল, 'ব্যাপারটাত' দেখতে হচ্ছে, হঠাৎ সাধু টাধু এল কোথা থেকে ?'

দ্রুত চলতে চলতে বললাম, 'হয়ত এখানেই থাকে। কতটুকুই বা জানি এখানকার ?'

'তা ঠিক, কিন্তু, ঐ দেখ, লোকটা আর নেই।'

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। সত্যিই ত', লোকটা গেল কোথায় ? ভূত নাকি ? কথাটা মনে হতেই গা-টা শিরশির করে উঠল। হঠাৎ তাতন বলল, 'আরে ঐ-ত, ঐ-ত লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর জেঠুর বাড়িটার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।

মনের কথাটা বলেই ফেললাম, 'ভূতটুত নয়তো ?'

তাতন বলল, 'তাও হতে পারে। তবে এই ভয় সন্ধ্যেবেলা, নির্জন বাগানে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা, এ-তো ঠিক ভদ্রভূতের কাজ না।'

চলতে চলতে আমরা লোকটার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে। একটা মোটা গুঁড়ির আড়ালে এসে থেমে পড়লাম। এই মুহূর্তে তাতনের কথাটাও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। ভূত হোক আর যেই হোক অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলেও খুব যে একটা সৎ উদ্দেশ্য তাও মনে হল না।

আমাদের দুজনেরই কেমন জেদ চেপে গেল। শেষ পর্যন্ত লোকটা কি করে সেটা দেখতেই হচ্ছে। হঠাৎ দুজনেই যুগপৎ বিস্ময়ে দেখলাম ঝোলার মধ্যে থেকে কি একটা বার করল। তারপর সেটাকে চোখে লাগিয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ফিসফিস করে তাতন বলল, 'জয় কাকু, এ ভূত আবার বাইনাকুলারও ব্যবহার করে। দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

এতক্ষণে সন্দেহ আমারও হয়েছে। মতলবহীন কোন লোক ঐ ভাবে বাইনাকুলার লাগিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না। কি চায় ও ?

শেষ বিকেলের যেটুকু আলো অবশিষ্ট ছিল সেটুকুও চলে গেল। কালো

মিশমিশে প্যান্থারের মত সন্ধ্যেটা ঝপাৎ করে নেমে এল। তার ফলে লোকটাকে একটা আবছা কালো দাঁড়ি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না।

ঠিক এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্যে আমি বা তাতন কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। অন্ধকারের মধ্যে আমাদের দুজোড়া চোখকে যতদূর সম্ভব সজাগ রেখে যখন আমরা লোকটাকে দৃষ্টির মধ্যে ধরে রাখতে ব্যস্ত হঠাৎ জলার ধারে পেত্নীর কান্নার মত একটা রহস্যময় আর তীক্ষ্ন আওয়াজ ভেসে এল ওপাশের গভীর জঙ্গল থেকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে। তারপর হঠাৎই ধুপধাপ শব্দে কয়েকটা মাটির চাপড়া এসে আমাদের আশেপাশে পড়তে শুরু করল।

ঘটনাটা রীতিমত আকস্মিক। এবং ভুতুড়ে। বিশেষ করে আমার কাছে। পালাব কিনা ভাবছি। ঠিক তখনই 'উঃ' শব্দ করে তাতন মাথা চেপে বসে পড়ল। একটা ঢেলা এসে লেগেছে ওর মাথায়। তাড়াতাড়ি করে ওকে তুলে ধরতে যেতেই 'ওই পালাচ্ছে' বলেই নিমেষের মধ্যে ও মাথা নীচু করে সোজা সামনের অন্ধকার জংগলে ঢুকে পড়ল।

অবস্থা নিঃসন্দেহে জটিল। ঢিল ছোড়াটা ক্ষণিক থেমেছে বটে কিন্তু এই অন্ধকার। এবড়ো খেবড়ো মেঠো আর জংলী বাগান। সাপ-টাপ থাকাও বিচিত্র না। এর মধ্যে তাতন তার অদৃশ্য আততায়ীর পিছনে ধাওয়া করেছে। আমার হাতে এমন কি একটা টর্চ পর্যন্ত নেই। তাতনেরও না। এই অবস্থায় কি করব বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তাতনকে যে করেই হোক ফেরানো দরকার। আর কিছু না ভেবেই আমিও তাতনকে লক্ষ্য করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিছুই চিনি না। কোনদিকে যাচ্ছি তাও জানি না। মিনিট তিন চার ছুটেছি বোধ হয়।

এর মধ্যে বার কয়েক হোঁচট খেয়েছি। এলোপাথাড়ি বেরিয়ে থাকা গাছের ফ্যাকরায় জামা ছিঁড়েছে। গাও ছড়েছে। হঠাৎ খেয়াল হল সামনে তাতন নেই। তার বদলে ভাঙ্গা এবং পুরনো নোনাধরা ইঁটের দেওয়াল। অর্থাৎ মল্লিক ভবনের সীমানা শেষ।

কিন্তু তাতন গেল কোথায়? ওকি তবে সীমানা পার হয়ে অচেনা লোকটার পেছনে পেছনে এখনও ছুটছে?

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। তাতনের নাম ধরে খুব জোরে দুবার ডাকলাম।

মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা যাকে বলে তাতনও ঠিক সেই রকম অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এল। ও তখনও হাফাঁচ্ছে। হাফাঁচ্ছি আমিও।

'হঠাৎ তুই কোথায় উবে গেলি বলত?'

আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'একটুর জন্যে মিশ হয়ে গেল জয়কাকু। তবে বাছাধন আমার চোখে ধুলো দিয়ে থাকতে পারবে না। ধরা পড়বেই।'

'হাউ ?'

'এ্যায়সা একখানা ইঁট তাক করে মেরেছি যেখানে লাগবে সেই খানটা হয় ফুলে যাবে নয়ত ফেটে যাবে। পালিয়ে যাবে কোথায় ?'

'কিন্তু সে গেল কোথায় ?'

'ওই যে দেখছ সামনের মন্দিরটা। ছুটতে ছুটতে ঐ ভাঙ্গা মন্দিরটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ব্যাস তার পরেই হাওয়া।'

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে তুইও মন্দিরের মধ্যে ঢুকছিলি নাকি ?'

'মন্দির কোথায় ? পোড়ো একটা ইঁটের ঘর। দুদিকেই খোলা। কিছু আগাছায় ভর্ত্তি।'

গুরুজন সুলভ ভঙ্গীতে আমি ওকে ছোট্ট ধমক দিয়ে বললাম 'খালি হাতে কেউ ওরকম পোড়ো মন্দিরে ঢোকে ?'

'জয়কাকু, তুমি কি ভুলে গেলে আমি ক্যারাটে শিখছি ?'

'তা হোক। লুকিয়ে থেকে আচমকা তোর মাথায় একটা ডাণ্ডা কষালে কি হত ?'

খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ও বলল, 'দ্বিতীয় মারটা কিন্তু ওকেই খেতে হত। আর সেটা হত মোক্ষম।

'ঠিক আছে ঠিক আছে, বেশী বাহাদুরী ভাল না। এখন চ।'

'মন্দিরটা একবার দেখে গেলে হত না ?

'না।'

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। তাতনের কপালের বাঁ দিকে একটা সুপুরির মত ডাঁই হয়ে ফুলে উঠেছে। ছঁড়েও গেছে। মারকিউরোক্রোম পেণ্ট করতে করতে নীল বলল, 'তাহলে একটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চার করে এলি বল !'

'কোথায় আর হোল', তাতন হাসতে হাসতে বলল, 'জয়কাকু যা ভীতু।

বললাম চল একবার মন্দিরটা দেখে আসি অমনি বলল বেশী বাহাদুরী ভাল্লাগে না। আচ্ছা তুমিই বল, মন্দিরটা একবার দেখলে হত না?'

আমার দেহের ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোয় লাল তুলো বোলাতে বোলাতে নীল বলল, 'না গিয়ে কোন ক্ষতিও হয় নি। কিছুই পেতিস না।'

'তাছাড়া', আমি বললাম, 'তোর অদৃশ্য আততায়ী কি অতক্ষণ তোর জন্যে ওখানে বসে বসে মশার কামড় খাবে?'

হঠাৎ অনাদিবাবু হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এলেন 'কি কাণ্ড দেখ দিকি। এই জন্যেই আমি ছেলে ছোকরাদের এই সব ব্যাপারে রাখতে চাইনি। কিছু একটা উল্টোপাল্টা হয়ে গেলে তোর বাবার কাছে কি আমি মুখ দেখাতে পারতুম?

'তুমি কিছু ভেবো না জেঠু। কাল সকালেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'না বাবা না। তুই কাল সকালেই বাড়ি চলে যা। ব্যানার্জী সাহেব যা পারে করুক। তোর আর এর মধ্যে মাথা গলাতে হবে না।'

'না জেঠু, এটা তোমার ঠিক কথা হল না। এই লাগাটা'ত জয়কাকুরও হতে পারত। তুমি কি তাহলে জয়কাকুকে বাড়ি ফিরে যেতে বলতে?'

অনাদিবাবু বোধ হয় একটু রাগলেন, 'তুমি আর জয়কাকু নিশ্চয় এক নও। হি ইজ অ্যাডাল্ট এনাফ। নিজের কিছু ভালমন্দ বোঝবার ক্ষমতা তার আছে। তাছাড়া তোমার কিছু বিপদআপদ হলে আদিত্যর কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।'

তাতন কিছু না বলে মুখ নীচু করে রইল। বড়দের মুখের ওপর কথা বলার অভ্যাস ওর নেই। অবস্থাটা পাল্টাতে চাইল নীল, 'আচ্ছা অনাদিবাবু, তাতনের মাথায় চোট লেগেছে এ খবরটা আপনি পেলেন কোথা থেকে?'

'ওই যে ইয়ে, মানে, আমার বাড়িতে যে বৌটা কাজ করে, কি যেন নাম, হ্যাঁ সুন্দরীর মা ঐ ত' বলল। শুনেই আমি হন্তদন্ত হয়ে আসছি।'

'সুন্দরীর মা জানল কেমন করে?

'এখানে মশাই বাতাসের আগে খবর ছোটে।'

'সত্যিই ত' আর খবর বাতাসের সঙ্গে ছোটে না। খবর ছোটে মানুষের মুখ থেকে কানে। সে যাই হোক বাগানের শেষে ঐ মন্দিরটা কি আপনাদেরই?

'ওটা নিয়ে একটু ডিসপিউট আছে। পাড়ার কেউ কেউ বলে মন্দিরটা নাকি মল্লিকদেরই সম্পত্তি। কিন্তু দলিলে তার কোন উল্লেখ নেই।

'তার মানে ওটা মল্লিকদের সম্পত্তি না।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

মন্দিরের ব্যাপারে নীল আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। সামান্য দু একটা

মামুলী কথাবার্তার পর অনাদিবাবু চলে গেলেন। ওঁনার আহ্নিকের সময় হয়ে গেছে। যাবার সময় বলে গেলেন শম্ভুকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

অনাদিবাবু চলে যেতেই তাতন জিজ্ঞাসা করল, 'সাধুর ব্যাপারটা তুমি জেঠুকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন নীলকাকু ?'

'আর একটু দেখি। উনি হয়ত কিছু নাও জানতে পারেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লোকটা বাইনাকুলার দিয়ে কি দেখছিল বলে তোর মনে হয় ?'

নীল উত্তর দেবার আগেই তাতন বলল, 'তার আগে যে জানা দরকার লোকটা কে ?'

'সেটা ঠিক ? তবে তোরা স্পষ্ট দেখেছিস যে ওর হাতে বায়নাকুলার ছিল ?'

তাতন বলল, 'অস্পষ্ট অন্ধকারে তাইত মনে হল। ঝোলা থেকে বার করেই চোখের সামনে রাখল।'

'যদি তাই হয় তাহলে বুঝতে হবে লোকটা আসল সাধু না। ওটা ওর ছদ্মবেশ।'

'হ্যাঁ নীলকাকু, আমারও তাই মনে হয়। আসল সাধুর কাছে বায়নাকুলার থাকতে পারে না। আমার মনে হয় লোকটাকে খুঁজে পেতে দেরী হবে না।'

নীল কিছু বলল না। কেবল ঘাড়টা একটু নাড়ল।

'কিন্তু', আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মাটির ঢেলাগুলো কি আমাদেরই লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল ?'

'নিশ্চয়ই। তুমি তাদের পাকা ধানে মই দেবে আর তোমাকে তারা ছেড়ে দেবে ? আচ্ছা তাতন, দেখি তোর বুদ্ধিটা কেমন এগুচ্ছে। আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলো দিয়ে তুই কিরকমভাবে কেসটা সাজাতে পারিস দেখি।'

তাতন মাথায় চোট লাগার জন্যে ইজি চেয়ারে শুয়ে ছিল। পাকা গোয়েন্দার মত ভুরু কুচঁকে ঠোঁটের ওপর তর্জনীটা রেখে বারকয়েক টোকাদিয়ে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, 'বেশ, বলছি। তবে ভুল হলে শুধরে দিও। একটা ভুতুড়ে ব্যাপার শুনে আমরা এখানে আসতে চাইলাম। আমাদের আসার কারণটা একমাত্র জেঠু ছাড়া আর কেউ জানত না। এমনকি জেঠিমাও না। এরি মধ্যে এসে গেল ছড়ায় হুমকি। হাউ ? এটা কেমন করে সম্ভব ? ভুত অন্তর্যামী এটা শোনা। যদিও আমি ওসব ভুতটুত বিশ্বাস করি না। তবু ধরলাম ভুতেই কাজটা করেছে। কিন্তু ভুত কি লিখতে পারে ? যদি লিখতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই সে বাঙালী ভুত। কিন্তু এইসব গাজাঁখুরি কথা ছেড়ে

দিলে যা থাকছে তা'হল ভুতের পেছনে একটা গভীর চক্রান্ত বা রহস্য লুকনো আছে। এবং সেটা কোন একজনের কাজ না। আর সেটা এই পলাশমায়ার বাইরেও ছড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ রহস্য যাই থাকনা কেন, এটা মোটামুটি একটা দলের চেনওয়ার্ক-এ ঘটে চলেছে। এ্যাম আই রং নীল কাকু ?'

নীল বলল, 'কথার মাঝখানে আমি কোন কমেণ্ট্স্ করতে চাই না। তুই বলে যা তোর ধারণা অনুযায়ী।'

'বেশ, তাহলে শোন, কোলকাতায়, কোন ভূত না, মানুষই আমাদের সাবধান করেছিল। এবং সেই লোকটার সঙ্গে যে লোকটা বাইনাকুলার দিয়ে দেখছিল এবং যে আমাদের ঢিল মেরে তাড়াতে চেয়েছিল এদের সবার মধ্যে একটা লিংক বা যোগাযোগ আছে। আর, সেই লোকগুলো মোটেও চায়না আমরা কিছু উট্কো লোক এসে এ বাড়িতে উঠি। কেননা আমাদের আসায় তাদের কোন কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। ঠিক আছে ?'

'নীল বলল, 'তোর বলা শেষ হয়ে গেছে ?'

'মোটামুটি।'

'তুই যতটা বললি সব ঠিক আছে। একটু বাকী। সেটা হল, সাধুর তোদের সামনে হাজির হওয়া আর ঢিল মারার ব্যাপারটাও আমার মনে হয় সাজানো। সবটাই তোদের মিসগাইড করার একটা চাল।'

'কি রকম ?'

'দিনের আলো কমে এলেও তখনও পরিপূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায় নি। এমন সময় তোরা দেখলি একজন সাধু বাগানের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আসলে তোদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাবার জন্যেই হয়ত লোকটা ঐভাবে যাচ্ছিল। এবং তোদের দেখিয়েই সে খানিকক্ষণ বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। বাইনাকুলার বার করল। এবং একাগ্র মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করল। এখন বলত, অপরাধী কখনও কাউকে দেখিয়ে কিছু করে ? করে না। যদি করে তাহলে বুঝতে হবে সেটা সে দেখিয়েই করতে চায়।'

'বুঝলাম। কিন্তু ঢিল ছোঁড়াটা ?'

নীল একটু হাসল। তারপর বলল, 'ওটাই ত' আসল উদ্দেশ্য। লোকটা নেহাৎই আনাড়ি। ধরা পড়ে গেল। নইলে আধা আলো আধা অন্ধকারের জংগলে মাটি ফুঁড়ে উঠে এল এক সাধু। একবার ভেল্কিও দেখালো—ফাঁকা জংগলের মধ্যে ভরসন্ধ্যেবেলা কোথা থেকে যেন দুমদাম ঢিল পড়া শুরু হয়ে গেল। এ ভূতের কাজ না হয়েই যায় না। সামনে ব্রহ্মদত্যি আর পেছনে ভূত। একটু উইক নার্ভের লোক হলে অজ্ঞান হয়ে যেত। আর পরদিনই তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালাতো।

নীল বোধ হয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে থেমে গেল। ট্রেতে করে তিন কাপ চা আর বিস্কিট নিয়ে ঘরে ঢুকল শম্ভু। চা-টা নিঃশব্দে রেখে লোকটা চলে যাচ্ছিল। নীল ওকে ডাকল, 'তোমার নাম শম্ভু ?'

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। এতক্ষণে ওকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলাম। চেহারাটা ঠিক টিপিক্যাল গাঁইয়া চাকরের মত। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। মুখে দু একদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঝুপড়ি গোঁফ। রংটা শ্যাম বর্ণ। গায়ে একটা ফতুয়া। কাপড়টা একটু তুলে পরা। খালি পা। বয়েস মনে হল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কাছে।

নীলের প্রশ্নে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আগেই বলেছি। খানিকটা ঢুলুঢুলু চোখে আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে জড়ানো আর ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এ বাড়িতে কতদিন আছ ?'

'প্রায় বছর খানেক।'

'কি কাজ কর ?'

'এই রান্নাবান্না, এইসব আর কি।'

আগে কোথায় থাকতে ?

'হাতিমারা।'

'জায়গাটা এখান থেকে কতদূর ?'

'কাছেই।'

'নিজের বাড়ি ?'

'কোথায় পাব ?'

'জমি জায়গা কিছু নেই ?'

'নাঃ।

'তাহলে থাকতে কোথায় ?'

'রামহরিবাবু ওঁর বাড়ির বাগানের কোণে একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেখানেই থাকতুম।'

'রামহরিবাবু কে ?'

'এখানেই থাকেন ;'

'পরিবার কোথায় ?'

'কার ?'

'তোমার।'

'নেই।'

'বিয়েই করনি বুঝি ?'

'অপদার্থ ছেলের হাতে মেয়ে দেবে কে ?'

'এ বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয় তা তুমি জান ?'

'জানি।'

'তোমার ভয় করে না।'

'ভূতে আমার কি করবে ? সন্ধ্যের পর জ্ঞানই থাকে না।'

'কেন ?'

'ঘুমিয়ে পড়ি।'

বুঝলাম শম্ভু নেশা করার কথাটা চেপে যেতে চাইছে। কিন্তু নীল ছাড়ল না। বলল, 'নেশা করার অভ্যেস আছে বুঝি ?'

প্রশ্নটা সরাসরি। উত্তরটাও এল সরাসরি, 'হ্যাঁ। ঐ জন্যেই ত' বিয়ে হল না।'

দুম করে নীল একটা আজগুবি প্রশ্ন করল, 'বাবুর কুকুরটাকেও বুঝি নেশা ধরিয়েছে ?'

কটকটে চোখে শম্ভু একবার নীলকে দেখে বলল, 'কুকুর আবার নেশা করে নাকি ? শুনিনি।'

নীল আর একটা উল্টো প্রশ্ন করল, 'আজ এই খোকাবাবুকে ভরসন্ধ্যেবেলা, ভূতে মেরেছে ঢেলা। খবরটা শুনেছ ?'

আগের মতই নির্বিকার চিত্তে শম্ভু বলল, 'শুনিনি, তবে হতে পারে। তেঁনারা ত' আশেপাশেই ঘোরাফেরা করেন।'

'তুমি ভূত বিশ্বাস কর ?'

'আমার বিশ্বাসঅবিশ্বাসে কি আসে যায়! লোকেরা বলাবলি করে। থাকতেও পারে।'

'তুমি নিজে কোনদিন দেখনি ?'

'বললুম ত' সন্ধ্যের পর আমার কোন জ্ঞান থাকে না।'

এত জেরা শম্ভুর বোধ হয় ঠিক পছন্দের না। তাই ও বলল, 'আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না যাব ?'

'আর একটা প্রশ্ন করব। বিকেলে তুমি কোথাও বেরিয়েছিলে নাকি ?'

আবার সেইরকম কটকটে চোখে নীলের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'না।'

'ঠিক আছে তুমি যেতে পার' বলতেই শম্ভু ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ওর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ নীল তাকিয়ে রইল। জানলা দিয়ে ওকে এখনও দেখা যাচ্ছে। নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'লোকটাকে কি বুঝলি ?'

'তোর মতই। কিছুই না।'

নীলকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার ধারে চলে এলাম। নীল বোধ হয় এখন থেকে আর কিছু বলবে না। হুঁ হাঁ উত্তর ছাড়া আমার স্টাডি অনুযায়ী ও এখন থেকে মৌনী হয়ে যাবে। ওর ভুরুটাও কুঁচকেছে। শিকারী বেড়ালের মত রহস্য নামক মাছটির সন্ধান পেয়ে গেছে। অর্থাৎ মাথার কাজ শুরু। তাতনও গভীর চিন্তায় মগ্ন। সিগারেট টানতে টানতে বাইরের দিকে তাকালাম। ঘন জঙ্গল কাকের পালকের মত অন্ধকারে ঢাকা।

ভোর হয়ে গিয়েছিল। পাড়াগাঁর ভোর। হাজার পাখির কিচির মিচিরে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। পাড়াগাঁর ভোর আমার দারুণ লাগে। চোখ খুলতেই কেবল সবুজ আর সবুজ। শহরে থেকে এত সবুজ সহসা চোখে পড়ে না। শুনেছি সবুজ রঙটা চোখ আর মনের পক্ষে খুব স্বাস্থ্যকর। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। ভোরের মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া আর সবুজ প্রকৃতির বুনো সোদা সোদা গন্ধে একটা নেশা আছে।

গায়ের পাত্‌লা চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে যখন আলসেমীটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি নীলের গলা পেলাম।'

'আর পাশ ফিরিস না। ওঠ্, বেরুতে হবে।'

মুখ ফিরিয়ে দেখি নীল তৈরী হয়ে বসে আছে। প্যান্ট, পাঞ্জাবী আর কালারড্ ছোট্ট চাদর। হাল্কা শীতে বেড়ানোর মুডে থাকলে ও সাধারণত এই ধরণের ড্রেস ক'রে।

হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাবি সাত সকালে ?'

'একটু প্রাতঃভ্রমণ করে আসি।'

'তাতন কই ?'

'সামনের জানলা দিয়ে তাকা, দেখতে পাবি।'

নীলের পিছনের জানলা দিয়ে দেখি স্কিপিং রোপ নিয়ে ও সমানে স্কিপিং করে চলেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গতকালের সেই পূর্বদিক ধরেই তিনজনে হাঁটতে শুরু করলাম। সন্ধ্যের আধা অন্ধকারে যে বাগান কাল

ছিল রহস্যময় আজ এই সকালের আলোয় তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার আর মালিন্য-হীন। কাল যে কিছু ঘটেছিল আজ তা বোঝাই যায় না। যে জায়গায় সেই ঢিলগুলো পড়েছিল সেখানে গিয়ে নীল দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করল। ওর মুখ দেখে বোঝা গেল না কিছুই। কি খুঁজছে তা সেই জানে। কিছুক্ষণ পর আমরা সেই ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পেঁছিলাম। কাল সেই সাধুটা এইখানেই দাঁড়িয়েছিল।

আমরা যে ভুল দেখিনি বা ভূত দেখিনি তার প্রমাণ পাওয়া গেল। তিন চারদিন আগে এদিকেও বৃষ্টি হয়েছিল। মাঠ ভিজে। কাদা কাদা। স্পষ্ট দেখলাম কয়েক জোড়া পায়ের ছাপ। ছাপগুলো একই পায়ের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

তাতন বলল, 'নীলকাকু, এই দেখ। কাদার ওপর স্পষ্ট পায়ের ছাপ। ওদিক থেকে হেঁটে এসেছে। আর এইখানে দাগটা বেশ ডিপ্। তার মানে এইখানটায় দাঁড়িয়েছিল।

'তাতো বুঝলাম। কিন্তু এ দিয়ে ত' আর কিছু প্রমাণ হয় না। তবে, পায়ের ছাপগুলোর মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে খুঁজে পাচ্ছিস? ভাল করে লক্ষ্য কর।'

নীলের কথায় আমি তার তাতন খুব মনোযোগ দিয়ে পায়ের ছাপগুলো পর্যবেক্ষণ শুরু করলাম। হঠাৎ, কয়েক মিনিট পর তাতন 'ইউরেকা' বলে চীৎকার করে উঠল, 'উঃ নীলকাকু, তোমার আইসাইটটা দারুণ। লোকটার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা নেই। তাইত?'

'হ্যাঁ, আসলে লোকটার বাঁ পাটাই ডিফেকটিভ। খুব সম্ভবত ঐ পায়ের ওপর দিয়ে একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেছে। ডান পায়ের তুলনায় বাঁ পায়ের পায়ের পাতা ইঞ্চিখানেক সরু।'

যুগপৎ দুজনেই বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ তাইত।'

'তোদের কাছে একটা আঙুলের অ্যাবসেন্স কেন ধরা পড়েনি এবার বুঝছিস? কড়ে আঙুল থেকে পাটা সমান সরলরেখায় কাটা। আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য কর। প্রত্যেকটা ছাপেই বুড়ো আঙুলের ডগাটা একটু বেশী ডিপ্ আর সামনের দিকে খানিকটা টানা। তাইত?'

দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

'কেন বলতে পারিস?

এবার তাতন বলল, 'বোধ হয় পারব।'

'বেশ বল্।'

'বাঁ পাটা একটু ছোট। আমার মামার বাড়িতে ভুবন বলে একটা লোক কাজ

করত। ভুবনের ডান পাটা ছোট ছিল। লোকটা যখনই দাদুর জন্যে চান করার জল তুলে আনত তখনই ভিজে পায়ের ছাপ মাটিতে পড়ত। ডানপায়ের ছাপটা খুব থ্যাবড়া আর টেনে চলতে হত বলে বুড়ো আঙুলের ওপর একটা অ্যাপস্টফির মত দাগ পড়ত। এখানেও তাই ঘটেছে।'

নীল তাতনের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস। এখন এই লোকটাকে খুঁজে পাওয়া কি খুব অসুবিধা হবে?'

আমি বললাম, 'গা ঢাকা দিয়ে থাকলে কি করে পাবি?'

'এই সব লোক বেশীদিন লুকিয়ে থাকতে পারে না।'

'আমাকেও একটা লোককে খুঁজে বের করতে হবে, গম্ভীর হয়ে তাতন বলল।

'কাল যাকে ইঁট মেরেছিলি?'

'হুঁ! ওটাকে আমি ধরবই।'

'বোধ হয় পারবি না। হয় মাথায় নয়ত পায়ে একটা ব্যাণ্ডেজ। ও রকম একগণ্ডা লোক পাবি এই এলাকায়। চোট বেশী লাগলে তোর চোখ এড়াতে কদিন বাড়িতে বসে থাকবে। তারপর চোট সেরে গেলে আবার বেরুবে। চল্ ওদিকের মন্দিরটা দেখে আসি।'

মন্দিরটা একেবারে আদ্যিকালের। কবেকার কে জানে। ছোট ছোট ইট। নোনা ধরা। দেওয়াল অর্ধেক ধসে গেছে। বটের আগাছায় ভর্তি। এককালে দরজা-টরজা ছিল। এখন দরজা বলে কিছু নেই। কেবল উইধরা ভিজে ফ্রেমটা ঝরঝরে হয়ে আট্‌কে আছে।

নীলই প্রথমে ঢুকে গেল। পেছনে আমরা। ভেতরের দৈন্যদশা আরো বেশী। মাথার ওপর গম্বুজটা ফেটে চৌচির। কিছু বটের ঝুড়ি নীচের দিকে ঝুলছে। বর্ষার জল জমে পুরু শ্যাওলা জমেছে। অনেককালের পুরনো শিবের বিগ্রহ পাতা রয়েছে ঠিক মধ্যিখানে। বিগ্রহের পাশ দিয়ে আগাছা জন্মেছে। মন্দিরে তেমন আর কিছু দেখার ছিল না। একটু আধটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে নীল মন্দিরের পিছনদিকে, যেদিকে একটা মানুষ মাথা অল্প ঝুঁকিয়ে বেরিয়ে যাবার মত ফোকড় রয়েছে, সেদিকে এগিয়ে গেল। মাথা নীচু করে আমরা তিনজনেই বেরিয়ে গিয়ে পড়লাম মন্দিরের পিছনের বাঁশবনে।

বাঁশবনটা ঘন হলেও চলতে অসুবিধা হয় না। 'বাঃ দারুণ' বলেই তাতন বাঁশবনে ঢুকে পাঁইপাঁই করে ছুট লাগাল। প্রকৃতিকে হাতের কাছে পেয়ে ওর আনন্দটা একটু বেশী। ছোট ছেলে ত। চিরকাল শহরে বড় হয়েছে। ন্যাচারালি পল্লীগ্রামের উদার প্রান্তর আর শান্ত গাছগাছালির পরিবেশ ওকে অনেকটা বাঁধনছেঁড়া ঘোড়ার মত করে তুলেছিল।

ছুটতে ছুটতে তাতন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। আমরা যখন ওর কাছে গিয়ে পোঁছলাম দেখি একটা কঞ্চি ও প্রায় ছিঁড়ে এনেছে পাকিয়ে পাকিয়ে। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর ও কঞ্চিটা ছিঁড়ে আনল।

বনটা লম্বা চওড়ায় অনেকখানি। আরো প্রায় মিনিট দশেক হাঁটবার পর আমরা গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়লাম। গঙ্গা বয়ে গেছে আধ মাইল তফাতে। বন এবং গঙ্গার মধ্যে ফাঁকা পোড়ো মাঠটা বোধহয় শ্মশান। অনেকটা দূরে একটা বট গাছের নীচে গোটা দুই কুকুরকে লাফালাফি করতে দেখলাম।

রোদ ক্রমশ চড়তে শুরু করছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি কাঁটা প্রায় আটের ঘরে। নীল আমাদের দুজনকে ছাওয়ায় দাঁড়াতে বলে শ্মশানটা আড়াআড়ি ভাবে পার হয়ে বটগাছটা পর্যন্ত চলে গেল।

শ্মশানে ওর কি দরকার পড়ল কে জানে। মিনিট দুয়েক বটগাছের নীচে ঘোরাঘুরি করে ফিরে এল।

আমি আর না বলে থাকতে পারলাম না, 'চল্ নীল এবার ফেরা যাক। ক্ষিদেটা খুব চনমন্ করছে।'

'হ্যাঁ, চ'। গোটা চারেক সেদ্ধ ডিম আর হাফ পাউন্ড রুটি না ওড়ালে এ ক্ষিধে নামবে না।'

বলেই নীল হনহন করে হাঁটা শুরু করে দিল।

গরম ওমলেটে খপ্ করে একটা বিরাট কামড় দিয়েই বুঝলাম কাজটা ঠিক বিবেচকের মতো হয় নি। একে গরম তায় কাঁচালঙ্কা পড়েছিল। না পারছিলাম ফেলে দিতে না পারছিলাম চিবোতে। মুখ হাঁ করে যখন বাইরের বাতাস নিয়ে ভেতরের গরমটাকে সইয়ে আনছিলাম নীল হঠাৎ বলল, 'আবার সমন। তাতন যাতো কাগজটা খুলে নিয়ে আয় কলাগাছের গা থেকে।'

আমি আর তাতন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি সামনের কলাবনের বাগানে একটা গাছের গায়ে চৌকো ছোট্ট কাগজ লটকানো রয়েছে। তাতন এক সেকেন্ডও দেরী করল না। কাগজটা একটা ছুঁচলো কাঠি দিয়ে কলাগাছের গায়ে গাঁথা ছিল।

তাতন ফিরে আসতেই নীল বলল, 'ছড়া ত' ?'

'হ্যাঁ ছড়া।'

'কি বলছে?'

'ইঁদুরগুলো মরছে ঘুরে পাচ্ছে না যে কিছু
বোকা তাঁতী বুঝছে নাকো মরণটা আছে পিছু'

'বাঃ চমৎকার। লোকটা রসিক ছড়াদার। ছড়ায় ছড়ায় সমন ছুড়ছে।'

তাতনের হাত থেকে নীল কাগজটা নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। কাগজের গন্ধটা শুঁকতে শুঁকতে বলল, 'তার মানে, পরিমলবাবু এখানে এসে পৌঁছে গেছেন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'পরিমলবাবু আবার কে?'

'যে লোকটা হাওড়া ষ্টেশনে তোর পকেটে বাসের টিকিট গুঁজে দিয়েছিল।'

'কি করে বুঝলি লোকটার নাম পরিমল আর সে এখানেও চলে এসেছে। তার দলের অন্য লোকও হতে পারত—'

'এ ক্ষেত্রে হয় নি। লোকটার নাম পরিমল কিনা জানি না তবে সে পরিমল নস্যি নেয় আর দুটো হাতের লেখা মিলিয়ে নে—।' বলেই ও পার্স থেকে বাসের টিকিট আর চৌকো কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিল—।'

নস্যির গন্ধটন্ধ কিছুই পেলাম না। তবে হ্যাঁ, একই লোক। আর একই ডট্‌পেনের কালি।

'কিন্তু ডট্‌পেনে লিখছে কেন?'

উত্তরে নীল বলল, 'ওটা কোন পয়েন্ট না। আজকাল ডট্‌পেনটা লোকে বেশী ব্যবহার করছে। এ লোকটাও তাই করেছে। আরও একটা কথা, ডটপেনের কালি রোদ বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যায় না।'

'কিন্তু নীলকাকু,

'হ্যাঁ বল্—'

'আমি ত' আগাগোড়া ব্যাপারটা কিছুই বুঝছি না—। আমরা এসেছি একটা ভুতের বাড়ি দেখতে। সত্যিই ভুত বলে কিছু আছে কিনা এটাই আমাদের জানার কৌতুহল তাই না—?'

'বলে যা।'

'কিন্তু এ যেন খুঁচিয়ে ঘা করা। এসব হুমকিটুমকি না দিলেও ত' চলত।'

'সেটা কে বোঝায় বল্? তবে ভুত ছাড়াও আরো কিছু রহস্য আছে এটা নিশ্চয় তোরা স্বীকার করবি?'

তাতন বলল, 'নিশ্চয়ই। নইলে আর মানুষের হাতের লেখায় দু দুবার হুমকি ছোড়া হবে কেন? কিন্তু রহস্যটা কি?'

এক চুমুককে অবশিষ্ট চা-টা শেষ করে নীল বলল, 'রহস্যটা বোধহয় এত তাড়াতাড়ি বেরুবার না। এর রুট অনেক গভীরে লুকিয়ে আছে বলেই আমার বিশ্বাস। আর, সেই লুকিয়ে থাকা রহস্যটা আমাদের কাছে চিরদিন অজানা থাকুক এটাই, যে আমাদের দ-দুবার সাবধান করেছে, তার ইচ্ছা।'

'তাহলে নীলকাকু, এখন কী করতে চাও ?'

'এখন আমাদের কিছুই করার নেই, কেবল ঘটনার অপেক্ষায় থাকা ছাড়া। তবে আমার মনে হয় খুব শিগগীরই আমরা এর মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছি।'

'তার মানে তুই বলতে চাইছিস—দু একদিনের মধ্যেই কিছু ঘটবে—?'

'আমার অনুমান মিথ্যে না হলে, তাই, কে, কে ওখানে ?'

মুখ তুলে দেখি দরজার সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চেহারাটা কালোকুলো। মুখশ্রীও তেমন ভালো না। সতেরো আঠারোর মত বয়েস হবে। একটা সবুজ ডুরে শাড়ি পরে রয়েছে। মাথা নীচু করে লাজুক মুখে বলল, 'বাবু আমি সুন্দরী।'

মানুষের চেহারা নিয়ে কিছু মন্তব্য করা উচিৎ না। আমি তা করতেও চাইছি না। কিন্তু এই মেয়েকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না।

তাতনের দিকে ফিরে তাকালাম। মেয়েটিকে ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কিন্তু নীলের মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। ও নির্বিকার বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ভেতরে এস—।'

মেয়েটি ধীর পায়ে ভেতরে এল। আগের মতই শান্ত আর নম্র স্বরে বলল, 'কর্তাবাবু বললেন, আপনাদের যদি খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে একবার বৈঠকখানায় যেতে—।'

'ঠিক আছে, তুমি গিয়ে বল আমরা আসছি।'

মেয়েটি চলে যাচ্ছিল। নীলের ডাকে আবার ফিরে তাকাল, 'তোমার মা এই বাড়িতে কাজ করে ?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'তুমি কর না ?'

'করি বাবু।'

'কি কর ?'

'জল তোলা। কাপড় কাচা এই সব।'

'তোমার মা কি করে ?'

'বাড়ির কত কাজ আছে। তবে মায়ের বয়েস হচ্ছে—আর পারে না—।'

'তুমি যে কাজ কর, তার জন্যে মাইনে পাও ?'

'এই মাস থেকে বাবু দেবেন বলেছে—'

'এটা ত' ভূতের বাড়ি ?'

সুন্দরী এবার ফিক করে হেসে ফেলল।

নীল জিজ্ঞাসা করে, 'হাসছ কেন ?'

'ভূত কোথায় ?' আমি ত' এই বাড়িতেই থাকি। ভূত ত' বাবু দেখিনি কোন দিনও।

'কিন্তু সবাই যে বলে ?'

সুন্দরীর আড়ষ্ট ভাবটা একটু কেটেছিল। সে ঠোঁট উল্টে বলল, 'না বাবু, আমার প্রেত্যয় হয় না।'

অবাক হলাম। গাঁয়ের মেয়ে। ভূত বিশ্বাস করে না।

'কেন হয় না ?'

'ওসব দুষ্টু লোকের বানানো কথা। বুকে হাত দিয়ে বলুক দিকিনি, কেউ কখনো ভূত দেখেছে ?'

নীল ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি ছড়িয়ে বলল, 'কেউ যদি তোমায় বলে অমাবস্যার রাতে সামনের ঐ বাঁশবনে একলা একলা যেতে, পারবে ?'

'হাতে একটা রামদা আর লণ্ঠন থাকলে নিশ্চয় পারব।'

বলে কি ? এ যে একেবারে গেছো মেয়ে। এর কাছে গেলে ভুতই ভয় পেয়ে পালাবে।

নীল ওকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। কেবল বলল, 'ঠিক আছে, তুমি গিয়ে বল আমরা আসছি।'

দরজা পর্যন্ত গিয়ে সুন্দরী আবার ফিরে এল, 'বাবু আপনাদের কাপডিশ গুলো নিয়ে যাব ?'

'হ্যাঁ নিয়ে যাও।'

ও চলে যাবার পরও নীল চট্ করে উঠে পড়ল না। একটা ফিল্টার উইলস্ ধরিয়ে অদ্ভূত ভাবে ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবল। আমি বুঝতে পারলাম, ওর অদৃশ্য থার্ড আইটা অন্ধকারে শিকারী বেড়ালের মত কিছু দেখতে পেয়েছে। ওর এই চেহারাটা আমার অনেক দিনের চেনা। আমি কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করলাম না। তাতনও না।

কয়েক সেকেণ্ড পর নীলের বোধহয় চৈতন্য ফিরে পেল। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওর মুখ থেকে আমরা দুজনেই স্পষ্ট শুনলাম একটা কথা, 'বড় চিন্তার কথা।'

বৈঠকখানা তখন জমজমাট।

ঘরের ঠিক মধ্যিখানে প্রকাণ্ড শ্বেত পাথরের সেণ্টার টেবিল। টেবিলটা পুরনো দিনের। মোটাসোটা কাজ করা পায়া। টেবিলটাকে ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার চারদিকে সাজানো রয়েছে। চেয়ারগুলো প্রায় ভর্তি। আমরা ঘরে ঢুকতেই এই প্রথম অনাদিবাবুর কুকুর টমিকে দেখলাম। টম তড়াক করে লাফিয়ে আমাদের কাছে এসে শোঁকাশুঁকি করতে লাগল। অনাদিবাবু ওকে ধমকে কাছে ডাকলেন। টমি একবার অনাদিবাবুর কাছে গিয়ে দুটো পাক খেয়ে ধপাস করে শুয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলল।

অনাদিবাবু এরপর এক এক করে আমাদের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বয়েস সকলেরই প্রায় অনাদিবাবুর মত। কেউ বা আরো বয়স্ক। সবাই স্থানীয় সজ্জন লোক।

প্রথমেই যাঁর সঙ্গে পরিচয় হল তিনি তারিণী সেন। বয়েস প্রায় ষাট ছুঁই ছুঁই। রোগা পাতলা ডিগ্‌ডিগে বুড়ো। ঝুলনো গোল সোনালি তারের চশমা নাকের ডগায় এসে থেমেছে। রিটায়ার কেরানী। বর্তমান পেশা হোমিও-প্যাথি। হোমিওপ্যাথি পড়া ছিল। এখন অবসর সময় টুকটাক ঐ করে কাটান। চশমার ওপর দিয়ে ঘোলাটে চোখ দিয়ে আমাদের দিকে একবার তাকালেন। হাত দুটো সামান্য উঠেই ফের নেবে গেল। কি জানি হাতে পোড়া বিড়িটা থাকার জন্যে কি না।

তারিণী সেনের ডান দিকে সুকোমল ভট্টাচার্য। বর্ণচোরা আম। বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে। স্বাস্থ্যটা ভালোই। বেশ সুখী সুখী চেহারা। তেলচকচকে টাক। গোঁফ দাড়ি নিখুঁত কামানো। ব্যবহারটাও বেশ মার্জিত। স্টেশনের দিকে ভট্টাচার্য মেডিকেল হল এঁনারই। ছেলেরাই দেখাশুনা করে। উনি মাঝে সাঝে গিয়ে বসেন। আলাপ করাতেই উনি টিপধরা নস্যিটা নাকের মধ্যে গুঁজে দিয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'কিন্তু মিঃ ব্যানার্জী এখানে ত' দেখার মত কিছুই নেই। হঠাৎ এখানে বেড়াতে আসা কেন?'

নীল মৃদু হেসে বলল, 'ঘরের পাশেই কত কি থাকে যা আমাদের দেখা হয় না। বাংলা দেশের গ্রাম, তার একটা আলাদা নেশা। একি অস্বীকার করা যায়?'

কান এঁটো করা হাসি হেসে সুকোমলবাবু বললেন, 'তা অবিশ্যি ঠিকই বলেছেন, ম্যালেরিয়াই থাক আর শহুরে রোশানাই নাই থাক, গ্রাম ইজ গ্রাম। সে একটা অন্য জিনিস। তা কদ্দিন থাকছেন ?'

'কোন ঠিক নেই। আজ বিকেলেও চলে যেতে পারি। আবার হপ্তাখানেক থাকতেও পারি।'

'থাকুন না মশাই। কে আপনাকে যেতে বারণ করেছে। যদ্দিন খুশী হয় থাকুন।'

সুকোমল বাবুর পাশেই বসেছিলেন রামহরি দত্ত। এখানে উপস্থিত সবার থেকে বয়েসে প্রবীণ। আমার মনে হল ওনার বয়েস প্রায় পঁয়ষট্টি ছেষট্টি হবে। তবে অথর্ব নন। এই হাল্কা শীতেও উনি কালো রঙের একটা তুষের চাদর জড়িয়েছেন। বয়েস ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে চায়। সুকোমলবাবুর কথা টেনেই বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ ভট্চার্য, নেতারা গ্রাম নিয়ে যতই তুলিলাফ খাক আর মুখে জগৎ মারুক, গ্রামের ভালোমন্দ নিয়ে তাদের তেমন মাথাব্যাথা আছে বলে ত' মনে হয় না। যাও বা ইলেক্ট্রিক এল তাও লোডশেডিং-এর ফ্যাচাং। এমন উব্কার তোদের কে করতে বলেছেলো বাপ। মধ্যিখান থেকে দিলি অব্যেস খারাপ করে। এখন ফ্যান না থাকলে চলে না। যত্তসব', বলেই উনি চুপ করে গেলেন।

দত্ত বাবুর পাশে বিজন দাস।

কেন জানিনা, ভদ্রলোক প্রবলভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। চেহারার মধ্যে বাঙালী ভাবটাই কম। জাপানী জাপানী টাইপ। চাপা নাক। ছোট ছোট চোখ। খুব ঘন চুল ছোট করে ছাঁটা। গোঁফ দাড়ি নেই। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পাঞ্জাবী না পরে যদি কিমোনো পড়তেন বলা মুশকিল হত তিনি জাপানী নন। তার ওপর গায়ের রঙটা উজ্জ্বল গৌর। বয়েস মনে হয় আটচল্লিশ থেকে বাহান্নর মধ্যে। পরিচয়ের পালা শেষ হবার পর জানা গেল উনি এখানে প্রায় বছর দশেক এসেছেন।

বিজনবাবুর পাশে বসেছিলেন দুজন অল্প বয়েসের ভদ্রলোক। মনে হয় আমাদেরই মত বয়েস, কি কিছু কম। ছুটির দিন বলেই হয়ত এঁরা অনাদি-বাবুর প্রভাতী আসরে যোগ দিয়েছেন। বিমল রায় আর তুহিন কর। কলকাতায় চাকরি করেন। বিমল ব্যাঙ্কে আর তুহিন এক সওদাগরী অফিসে।

নীলের ঠিক বাঁদিকে ছিলেন তারক প্রামাণিক। রিটায়ার্ড পুলিস অফিসার। বয়েস ষাটের কাছে। কিন্তু চেহারায় তা ধরা যায় না। তার ওপর বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। রিস্ট আর ফোরআর্মস দেখলেই বোঝা যায় এককালে বেশ শক্তি ধরতেন গায়ে। অনেকটা অনাদিবাবুর মত করে চুল ছাঁটা। সাদা

বাংলায় যাকে বলে কদম ছাঁট। কদম ছাঁট বেশ পেকেছে। আমাদের কোন পাত্তাই দিলেন না ভদ্রলোক। মুখ থেকে চুরোট না নামিয়ে ভুরু কুঁচকে একবার তাকালেন। তারপর 'হুঃ' বলে ফের চোখের সামনে মেলে ধরা কাগজে মন দিলেন।

সব শেষে অর্থাৎ আমার ডান দিকে আর অনাদিবাবুর বাঁদিকে বসে ছিলেন নীলমণি পাকড়াশী। বয়েসটা বোঝা শক্ত। পঞ্চাশও হতে পারে আবার ষাট পঁয়ষট্টিও হতে পারে। গায়ে গেরুয়া রঙের পাওয়ার লুমের পাঞ্জাবী। কাজ কর্ম কিছুই করেন না, যাকে বলে বেকার বুড়ো।

মোটামুটি সকলের সঙ্গে পরিচয় হবার পর হঠাৎ নীল সবার মধ্যে একটা প্রশ্ন তুলল, 'আপনারা মোটামুটি সবাই এখানকার পুরনো বাসিন্দা। শুনেছি এ বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আছে। কেউ ভূতটুত দেখেছেন নাকি?

এ প্রশ্নের সহসা কেউ কোন উত্তর দিল না। কেবল তারকবাবুর মুখ থেকে আবার সেই রহস্যময় 'হুঃ' শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। আগের 'হুঃ' আর এবারের 'হুঃ'র মধ্যে একটু তফাৎ ছিল। আগের 'হুঃ'টাকে 'অ' বলা যেতে পারে। অর্থাৎ তোমরা এসে খুব কেতার্থ করেছ এমনই একটা মানে দাঁড়ায়। আর পরের 'হুঃ'টার মানে যত্তসব বোগাস ব্যাপার।'

কারো কাছ থেকে যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না তখন নীলই আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা রামহরিবাবু, আপনি ত' সব থেকে প্রবীণ ব্যক্তি। এই ভূতের ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়?'

রামহরি দত্ত বললেন, 'তার আগে বলুন যথার্থই ভূতের অস্থিত্ব আছে কিনা?'

হাসতে হাসতে নীল বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজে কোনদিন ওসব দেখিনি। তবে আমি দেখিনি মানে এই না যে ভূতবলে কিছু নেই। আপনি প্রবীণ লোক। তাই আপনার কাছে জানতে চাওয়া।'

দত্ত খুব সম্ভবত বিগলিত হলেন। একে তাঁকে প্রবীণ বলে সম্মানিত করা তার পর তার কাছে মতামত চাওয়া। মানুষ স্তুতিপ্রিয়। অন্যের মুখে স্তুতি পেতে সে বোধহয় সব থেকে বেশী ভালবাসে।

বিজ্ঞের মত মাথা দোলাতে দোলাতে দত্ত বললেন, 'আছে। আছে। তেঁনারা আছেন। তাহলে একটা গল্প শুনুন। গল্প না। সত্যি কথা।'

হঠাৎ ওঁনার পাশে বসে থাকা বিজনবাবু বলে উঠলেন, 'আজ তাহলে আমি উঠি। সকাল বেলাই সব কি আরম্ভ হল।'

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে দত্ত বললেন, 'ভায়া কি ভয় পেলে নাকি?'

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে বিজনবাবু বললেন, 'না না, ভয়ের কি আছে? ভয় আবার কি? স্টেশনের দিকে একটা কাজ ছিল তাই।'

'বুঝি বুঝি, ঠিক আছে। নয়, নাই শুনলে; বলব না—।'

তুহিন আর বিমল কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাছাড়া ইতিমধ্যে ঘরে ভাজা বেগুনি আর চা দিয়ে গিয়েছিল সুন্দরী। একটা গরম বেগুনি তুলে নিয়ে তুহিন বলল, 'না খুড়ো, বিজনদার ভূতের ভয় থাকলে উনি চলে যেতে পারেন। কিন্তু এমন এক জমাটি আসরে আপনার রসালো ভূতের গল্প আর চা বেগুনি, আনপ্যারালাল। আপনি শুরু করুন।'

দত্ত বোধ হয় একটু রেগে গেলেন, 'দুদিনের ছোকরা তোমরা। এটা গল্প তোমায় কে বলল? নিজের চোখে দেখা।'

বিমল বলল, 'তাহলে ত না শুনে থাকাই যায় না।'

আবার পাশ থেকে হুঃ শোনা গেল। তারক প্রামাণিক মুখ থেকে চুরোট নাবিয়েছেন, 'আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?'

'তবে আর বলছি কি? ১৯৪৭ সাল। আগস্টে ভারত স্বাধীন হল। আমার বয়েস তখন তুহিন বিমলের থেকেও বেশী। মনে ত' খুব আনন্দ। যাক জীবদ্দশায় ভারতের স্বাধীনতা দেখে গেলুম। তবে এখন মনে হয় কিসের স্বাধীনতা? কার স্বাধীনতা? আরে ছ্যা ছ্যা। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, খাবার নেই, জল নেই, আলো নেই, পাখা নেই—'

আবার হুঃ, 'এই আপনার ভূতের গল্প?'

'আঃ পরামাণিকবাবু, সব কিছুরই একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। এ কি আপনার চাষাড়ে পুলিশি ডায়েরী লেখা নাকি? কি করে যে আপনি নাতি নাতনী নিয়ে ঘর সংসার করেন ভেবে পাইনা।'

এরপর নিশ্চয় হুঁঃ আর চুপ থাকতেন না। অতীতের পুলিসী মেজাজ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠত। ম্যানেজ করল নীল, 'তারপর কি হল বলুন দত্তবাবু।'

দত্তবাবু ফের শুরু করলেন, 'প্রথম দাঙ্গা শুরু হয়েছিল সেই ছেচল্লিশে। স্বাধীনতা পাবার পরও সেটা থামল না। আবার শুরু হল কচুকাটা। হিন্দু মোছলমানে ঘ্যাচাং ঘ্যাচ। যে যাকে সুবিধে পাচ্ছে কুপিয়ে দিচ্ছে। দুদিন আগে যে লোকটাকে ইকবাল কাকা কি নিতাই দাদা বলে ডেকেছে, দুদিন আগে যার মাকে মা, কি চাচাকে চাচা বলে সম্মান দিয়েছে দুদিন পরই তারা সব যে যার পর হয়ে গেল। স্যাঙাতের পো'রা রক্তগঙ্গার খেলায় মেতে উঠল। একবারও বুঝল না এ সেই হতচ্ছাড়া ইংরেজদের কেরামতি—'

হুঁঃ বলে তারকবাবু খবরের কাগজটাকে সম্পূর্ণ খুলে নিয়ে নিজের মুখটাকে গার্ড করে নিলেন। দত্তবাবু কিন্তু গল্পের তোড়ে হুঁঃ এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন নি। করলে কি হ'ত বলা যায় না। তিনি তখনও বলে চলেছেন,

'তখন আমি থাকতুম ছাতিমপুরে। আজ থেকে প্রায় তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর আগের কথা। কি একটা কাজে শহরে গিয়েছিলুম। ট্রেন চলার কোন ঠিকঠিকানা ছিল না। যে ট্রেন পেঁছিবার কথা দুপুর তিনটেয় সেটা পরের দিন তিনটের সময় এলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কলকাতা থেকে ট্রেনটা যখন ছাতিমপুর স্টেশনে এসে থামল তখন রাত প্রায় নটা। স্টেশনটা ঘুটঘুট করছে। একটাও লোকজন নেই। সন্ধের আগে যে যার সব বাড়ি ফিরে যায়। সত্যিকথা বলতে কি তখন বাড়ির বাইরে থাকাই বিপজ্জনক। আসলে সেই সময় মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করার কথাই ভুলে গিয়েছিল।

প্রাণটা হাতে করে স্টেশন থেকে কাঁচা রাস্তায় নামলুম। ইচ্ছে ছিল একটা রিকশা যদি পাওয়া যায়। কিন্তু সব ভোঁ-ভাঁ। একবার মনে হয়েছিল স্টেশনেই থেকে যাই। ওখানে তবু দু একটা আর্মর্ড পুলিস ছিল। কিন্তু ঘরে বৌ আর একরত্তি ছেলের কথা মনে পড়তেই দুর্গানাম করে হাঁটা শুরু করলাম। একে অমাবস্যার রাত—'

ফস্ করে বিজনবাবু বলে উঠলেন, 'আবার অমাবস্যা ঢোকালেন কেন?'

'দমাক্ করে মধ্যিখানে একটা কথা না বললে চলে না? অমাবস্যার রাতকে কি ফুটফুটে জ্যোৎস্না বলতে হবে? পাঁজি খুলে দেখ গিয়ে ৪৭ সালের ২৯শে আগস্ট কোন্ পক্ষ চলছিল।'

তুহিন বলল, 'আঃ বিজনদা, তুমি এত বাগড়া দাও কেন বলত? গল্পের ফ্লো'টা নষ্ট হয়ে যায়। খুড়ো, তারপর কি হল বলুন।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলুম, হাঁটছি। প্রাণটা হাতে করে। বত্রিশ বছর আগের ছাতিমপুর বুঝতেই পারছেন আজকের গ্রামের তুলনায় কতটা ব্যাক।

তার ওপর দাঙ্গার জন্যে রাস্তায় কোন আলো নেই। সাপখোপের ভয় তখন উবে গেছে। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হল কে যেন পা টিপে টিপে পেছন পেছন আসছে—'

সুকোমলবাবু এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। হঠাৎ বললেন, 'আপনি দেখলেন?'

'না, মনে হল। শুকনো পাতার ওপর পায়ে চলার স্পষ্ট আওয়াজও পেলুম। পেছনে না তাকিয়ে আমি তখন চলার গতি বাড়িয়ে দিলুম। কি বলব তোমাদের পেছনের সেই আওয়াজটাও তার গতি বাড়িয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। মনে মনে ভাবলুম না; আর এগুনো সমীচীন নয়। কে জানে কখন পিছন থেকে ঘাড়ের ওপর কোপ বসিয়ে দেয়। বরং মুখোমুখি লড়ে মরাই ভালো। এই মনে করে দুম করে দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে তাকালুম।

ওয়া। কোথায় কে? একরাশ অন্ধকার ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই! 'তাজ্জব কি বাত্' ভেবে আবার চলা শুরু করলুম। আবার সেই আওয়াজ। আবার দাঁড়ালুম। আওয়াজও থেমে গেল। আবার চলা। আবার আওয়াজ। হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড়তে শুরু করলুম। বললে বিশ্বাস করবেন না আওয়াজটাও তখন দৌড়চ্ছে।

সরু পায়ে চলা পথ। দুপাশে ঘন জঙ্গল। মাথার ওপর একটাও তারা নেই। এখানে দুতিন জনে আমাকে কেটে রেখে গেলেও কেউ বাঁচাতে আসবে না। হঠাৎ মাথায় আমার একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আচমকা সাঁই করে খানিকটা দৌড়ে গিয়ে পাশের জঙ্গলে একটা কুলগাছের ঝোঁপে লুকিয়ে পড়লুম। পেছনের লোকটাকে এগিয়ে দিই। তারপর আমিই পেছন থেকে ওকে আক্রমণ করব।

আমি ত' লুকিয়ে পড়লুম। কিন্তু কেউ আর অতিক্রম করে গেল না। মনে মনে যখন ভাবলুম, ভারি আশ্চর্য ত' লোকটা কি অন্তর্যামি? আমার মতলব টের পেয়ে আগেই ও লুকিয়ে পড়েছে? হঠাৎ, "এই দেখ দেখ;' এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, বলেই দত্তবাবু নিজের হাতটা শ্বেত-পাথরের টেবিলের ওপর মেলে দিলেন।

দত্তবাবুর হাতের দিকে তেমন কারো নজর ছিল না। পরের ঘটনার বিবৃতির জন্যে সবাই উদগ্রীব। আড়চোখে একবার বিজনবাবু আর একবার 'হুঁঃ' কে দেখলাম। বিজনবাবু স্টাচুর মত বসে আছেন। আর 'হুঃ' এখনও খবরের কাগজের আড়ালে।

দত্তবাবু ফের শুরু করলেন, 'তোমাদের কি বলব, হঠাৎ দেখলুম আমার সামনে আলকাতরার মত জঙ্গলের মধ্যে থেকে কে যেন এগিয়ে আসছে। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলুম। যে আসছে সে একজন। হাতে অস্ত্রই থাক আর যাই থাক একজনের সঙ্গে লড়বার মত বুকের পাঠা আমার ছিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মালকোঁচা বেঁধে নিলুম। লোকটা ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আর আমিও তৈরী। বেগতিক দেখলেই ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ব।

লোকটা যখন একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখলুম ওর হাতে কোন অস্ত্র নেই। আর ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটাকে আমি চিনতেও পারলুম। নাসিম। আমার ছোটবেলার বন্ধু। প্রাণের বন্ধুও বলা যেত। আশ্বস্ত হলুম। আর যাই হোক নাসিম আমাকে খুন করতে পারে না। তবে এই রাতে এই নিস্তব্ধ জঙ্গলে ওকে একলা আসতে দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিলুম, জিজ্ঞাসা করলুম, "কিরে নাসিম, তুই এখানে এত রাত্রে?"

নাসিম কিন্তু নড়লও না কিছু বললও না। আমি আবার বললুম, "চল্ চল্ বাড়ি চল্। দিনকাল খুব খারাপ। এতরাত্রে আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়।" বলেই আমি ওর হাত ধরতে গেলুম। মনে হল ও যেন একটু পেছিয়ে গেল, তারপর অস্পষ্ট হিসহিসে গলায় ওকে বলতে শুনলুম, "ছানু, ছানু আমার ডাক নাম, এখানে আর থাকিস না। তাড়াতাড়ি বাড়ি যা।" আমি বললুম, তাতো যাবই। তুইও চল।

আবার সেই হিসহিসে গলায় এক ধরনের ফ্যাসফেঁসে হাসি শুনলুম। মনে মনে ভাবলুম, আশ্চর্য, নাসিমের সর্দি টর্দি হয়েছে নাকি ? এ রকমভাবে হাসছে কেন ? গলার আওয়াজটাই বা ওর এমন ফ্যাঁসফেঁসে কেন ? বোকার মত ওর দিকে তাকিয়ে আছি। আগের মতই অস্পষ্ট গলায় বলল "আমি ত' বাড়ি চলেই গেছি, তুই আর দেরি করিস না। জায়গাটা সত্যিই খুব খারাপ।"

'ওর কথার মাথামুন্ডু বুঝলুম না। বললুম, "তুই বাড়ি চলে গেছিস মানে ?"

'আজ সকালবেলা, তখন সাতটা বাজে, তোদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তুই ছিলি না। চলে আসছি। হঠাৎ তোদের পাড়ায় সবাই মিলে আমাকে ঘিরে ধরল। তারপর সবাই মিলে রামদা নিয়ে তেড়ে এল। আমি বললাম আমার বিবি আছে, পোলাপান আছে। কেউ শুনল না। এই দ্যাখ, এখনও রক্ত পড়ছে—আমাকে টুকরো টুকরো করে এই জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গেছে।'

ওর কথাগুলো তখনো শেষ হয় নি। সেই অন্ধকারেই টের পেলুম সামনে নাসিম নেই আর আমার পায়ের কাছে কার যেন একটা ঠাণ্ডা দেহ পড়ে আছে।

এরপর কি হয়েছিল আমার মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে দেখি আমার বৌ মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে।'

গল্প শেষ করে দত্তবাবু বললেন, 'এর পরও কি বলবেন ভূত নেই ?'

সে কথার উত্তর দেবার আগেই একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনলাম। তারপরই ধপ্ করে একটা শব্দ। শ্বেত-পাথরের টেবিলের ওপর বিজন বাবু মাথা এলিয়ে দিয়েছেন।

এতক্ষণে আমার পাশে বসে থাকা নীলমণি পাকড়াশির মুখে কথা শোনা গেল, 'যাঃ, এদ্দিনের লোকটা, শেষ হয়ে গেল।'

অবশ্য সে কথা সবার কানে গেল না। হৈ-হৈ করে সবাই বিজনবাবুর কাছে উঠে গেছেন। সুকোমলবাবু উঠেই বিজনবাবুর নাড়ী টিপে ধরেছেন। তুহিন আর বিমল বিজনবাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'বিজনদা, বিজনদা, কি হল আপনার ?'

অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পরই বিজনবাবু আস্তে আস্তে মাথাটা তুললেন। অদ্ভুত একটা ঘোর লাগা চোখে সবার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'শরীরটা খারাপ লাগছিল। তাই। ও কিছু না। আপনারা ব্যস্ত হবেন না।'

প্রভাতী আসর আর জমল না। তুহিন আর বিমল বিজনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল। যদিও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত বিজনবাবুকে "আবার এসব কেন ? আমি ত' ঠিকই আছি" বলতে শোনা গেল। তবু অনাদিবাবু ওঁকে একলা ছাড়তে ভরসা পেলেন না।

ধীরে ধীরে ঘরটা খালি হয়ে গেল। তারিণী সেন এতক্ষণ চেয়ারে বসেই ঘুমোচ্ছিলেন। ওঁকে ডাকতেই, ওঃ আসর শেষ। তাহলে উঠি অনাদি।' বলেই চলে গেলেন। সুকোমল আর নীলমণিও চলে গেলেন।

তারক প্রামাণিক 'হুঃ' বলে কাগজ পাট করে উঠতে উঠতে বললেন, 'দত্তবাবু ভূতের গল্প লিখুন। ভাল কাটবে। সকালে উঠেই যা একখানা ছাড়লেন।'

দত্তবাবুর পাল্টা উত্তর না শুনেই উনি চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে তখন আমি, নীল, রামহরি দত্ত আর অনাদিবাবু। নীল একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'দত্তবাবু সত্যিই এমন কোন ঘটনা ঘটেছিল নাকি ?'

একটু আগেই তারক প্রামাণিক ঠাট্টা করে গেছেন। সেই ঝালটা বোধহয় আমাদের ওপরই ঝাড়লেন। খ্যাঁক খ্যাঁক করে বলে উঠলেন, 'তবে কি ভাবলেন এতক্ষণ আপনাদের ছিলিম সাজার জন্যে গাঁজা সাপ্লাই করছিলুম ? যত্তসব—বলেই উনি খরবরিয়াল লাট্টুর মত বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ দুপুরের দিকে বৃষ্টি এসে গেল। বৃষ্টি আরো হবে। আকাশের মুখ কালো হয়ে আছে। আসন্ন শীতের মুখে এ ধরনের বৃষ্টি মোটেই ভালো লাগে না। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে শীতটা বেশ জাঁকিয়ে আসরে নামবে।

নীলের মুখটাও মেঘলা আকাশের মত থমথম করছে। অসম্ভব রকমের গম্ভীর আর চিন্তাচ্ছন্ন। মনে হয় ও খুব ভাবছে কিছু নিয়ে। এত ভাবার কি হল তা বুঝতে পারলাম না। আড়চোখে ওকে দেখলাম। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে একমনে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করে চলেছে। তাতনও ঘরে নেই। খাওয়াদাওয়ার পর ওকে দেখলাম একবার অনাদিবাবুর ছাদে উঠছে। তারপর থেকে নোপাত্তা। অগত্যা আমাকেও একটা বই মুখে নিয়ে শুয়ে পড়তে হল।

বোধহয় আধঘণ্টা হয় নি। সবে তন্দ্রা মতন এসেছিল, নীলের গলার আওয়াজ পেলাম, 'কতকগুলো ব্যাপার সত্যিই ভাবার—তাই না?'

বললাম, 'না বললে কি করে বুঝব?'

'আচ্ছা বলতে পারিস রামহরি দত্ত হঠাৎ এরকম একটা গল্প ফেঁদে বসল কেন?'

'ওটা তোর গল্প বলে মনে হল?'

'আমার মনে হওয়া না হওয়া পরের অংশ, তোর কি মনে হল?'

'খানিকটা সত্যি খানিকটা হ্যালুসিনেশন, দুর্বল মনের কিছুটা রিঅ্যাকশান, এইসব মিলিয়ে একটা টোট্যাল হচ্‌পচ্‌।'

'তার মানে তুইও যথেষ্ট বিশ্বাসী নস। বেশ, কটকটে দিনের আলোয় ঘরে আরো দশজন লোক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সামান্য একটা গল্প শুনেই একটা লোক অসুস্থ হয়ে পড়ল এটা বিশ্বাস হয়?'

'জগতে কতরকম লোক আছে। বিজনবাবু হয়ত খুব উইক নার্ভের লোক—'

'হুঁ। চরিত্রগুলো সবই রহস্যময়। একজন অত্যাধিক উইক নার্ভের লোক, অথচ ভূতের আড্ডায় বসে শুনতেও চায়—'

'এটাই ত' ন্যাচারাল, ভূতে যাদের সব থেকে ভয় বেশী তারাই আঁটোসাঁটো হয়ে ভূতের গল্প শোনে।'

'হুঁ, তবে আমার সব থেকে ভাবনা সুন্দরীর অসম্ভব সাহসের কথা শুনে। ওটা যদি সত্যি হয় তাহলে ত' সেটা আর একজনের মনঃপুত হবে না। এক্ষেত্রে—'

কি যে নীল বকে যাচ্ছে আমার মাথায় তার মাথামুণ্ডু ঢুকছে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই কার কথা বলছিস?'

'নাটের গুরু।'

'তিনি আবার কে?'

'এত শিগগীরই জানতে পারলে ত' হয়েই গেল। তাছাড়া তার সত্যি

অপরাধটাই বা কি ? অবশ্য অপরাধ করার সময় প্রায় এসে গেছে। 'ইভিল ইজ নকিং এ্যাট দ্য ডোর।'

'কি বলছিস তুই ?'

'বলছি একজন প্রচণ্ড সাহসী, একজন ভীষণ রকম অবিশ্বাসী, একজন অসম্ভব ভীতু, আর একজন গল্প বানাতে ওস্তাদ। এর মধ্যে কে কার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ? উঁ, বলতে পারিস ?'

আমি পাশ ফিরে শুতে শুতে বললাম, 'কেস ক্লীয়ার হলে সমস্ত গল্পটা আমায় বলিস। তার আগে আমার মাথায় কিছু ঢুকবে না।'

'তুই সত্যিই একটা ন্যাদস।' বলে নীল আবার ধ্যানে বসে গেল।

বিকেলের দিকে ঘুমটা ভাঙল সুন্দরীর ডাকাডাকিতে। সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ধূমায়িত কাপ। চোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসলাম। প্রায় চারটে বাজে। বৃষ্টিটাও থেমে গেছে। ঘরে নীল বা তাতন কেউই নেই। সুন্দরীর হাত থেকে কাপটা নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবুরা কোথায় গেলরে ?'

'তেনারা সব ছাতে ঘুরছেন কর্তাবাবুর সঙ্গে।'

'ও, আচ্ছা তুই এখন যা।'

তাড়াতাড়ি চা শেষ করে আমিও ছাদে গেলাম।

নীল আর অনাদিবাবুকে দেখলাম ছাদের দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনাদিবাবু হাত নেড়ে কি যেন বলছেন।

অনাদিবাবুর কুকুর টমি এগিয়ে এসে আমাকে একটু শুঁকে টুঁকে ফিরে গেল। ছাদটা আর পাঁচটা ছাদের মতই। তবে বেশ বড় সড়। উল্লেখযোগ্য কিছু দেখার ছিল না। তবে একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

বাড়ির পূর্বদিকে অর্থাৎ অনাদিবাবুর ঘরটা যেদিকে সেদিকেই একটা বিশাল বটগাছ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছটার একটা মোটা শাখা এসে পড়েছে প্রায় ছাদ বরাবর। একটু কেরামতি জানা থাকলে ঐ মোটা ডাল বেয়ে অনায়াসে এবাড়ির ছাদে এসে নামা যায়। নীলকে কিছু বললাম না। তবে মনে হয় নীলের চোখে এটা নিশ্চয় এড়িয়ে যায় নি। কিন্তু তাতনকে কোথাও দেখলাম না। ওকে আজ প্রায় সারাদিনই দেখতে পাইনি।

কিছুক্ষণ পর আমরা নীচে নেমে এলাম। ওঠার সিঁড়ি দিয়ে না। ছাদ থেকে একটা ঘুরনো সিঁড়ি অনাদিবাবুর বাড়ির উত্তরদিকের বারান্দায় নেমে গেছে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে দোতলার বারান্দায় পেঁছিলাম।

বারান্দাটা বেশ বড় সড়। অনাদিবাবুর ঘরের পরে সারি সারি চারখানা ঘর। ঘরগুলো সবই ভেতর থেকে চাবি দেওয়া। উনি বললেন ওনার পাশের

ঘরটা খাওয়া দাওয়ার জন্যে রাখা আছে। বাকি দুখানা খালিই থাকে। দুই ছেলে পলাশমায়ায় এলে ওখানেই উঠবে।

চওড়া বারান্দার চারদিকে টবে বসানো নানান ফুলগাছ। জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল এসব ওঁর স্ত্রীর শখ। বারান্দার ঠিক মধ্যিখানে একটা বিশাল টব। মনে হয় অর্ডার দিয়ে বানানো। টবে লাল আর কালো রঙের গোল্ড ফিশ খেলা করে বেড়াচ্ছে। বারান্দা থেকে অনাদিবাবুর ঘরে ঢোকবার মুখে নীল বন্ধ দরজার মুখে একবার থমকে দাঁড়াল। তীক্ষ্ন দৃষ্টি ফেলে একবার কি যেন দেখল। তারপর ঘাড় নাড়তে নাড়তে নিজেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

এই নিয়ে দুবার এঘরে এলাম। ঘরে ঢুকেই তাতনকে দেখতে পেলাম। তন্ময় হয়ে ও সেই কাঁচের ক্রেশকোটা দেখছিল। এতই তন্ময় হয়ে ছিল যে আমাদের আসাটা টের পেল না। ওকে বিরক্ত না করে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পাশের ঘরগুলো এক এক করে অনাদিবাবু খুলে দেখালেন। ঘরগুলো মোটামুটি ফাঁকা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধুলোও পড়েছে। কেবলমাত্র যে ঘরটাকে খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেটাই বেশ ঝকঝকে। দেখার মত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ছিল না।

নীচে নামতে নামতে নীল বলল, 'এই ঘরটায় আমি পরে একবার আসব। কাউকে কিছু না জানিয়ে। আপত্তি নেই ত' ?'

'কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কাউকে বলতে আপনি কি মীন করছেন ?'

'মানে বাড়ির ঝি চাকর কেউ জানবে না এই আর কি।'

'স্বচ্ছন্দে।'

নীচে নেমে এলাম। নীচের ঘরগুলো আগেই দেখা ছিল। ওগুলোর দিকে ও আর এগুলো না। তাছাড়া ততক্ষণে সন্ধেও নেমে এসেছে। সিঁড়ির ঠিক পাশেই দেখি টমি ঘুমচ্ছে।

বাগান পেরিয়ে গেস্টহাউসে আসতে আসতে নীল স্বগতোক্তি করল, 'কুকুরকে কুম্ভকর্ণ করার কি মানে ?'

নীলের অদৃশ্য থার্ড আই যে কত প্রখর আর ওর প্রেডিকশান যে এত

তাড়াতাড়ি ফলে যাবে তা ভাবতে পারিনি। পরপর কয়েকটা ঘটনা তাতন আর আমার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে তিন জনে গল্প করতে করতে রাত একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য সব আলোচনাটাই অনাদিবাবুর বাড়ি কেন্দ্রিক। বিশেষ করে তাতনের কাছে কাঁচের ফ্রেমকোটা খুব রহস্যজনক। ওটার মধ্যে ও যেন কি আবিষ্কার করেছে। জিজ্ঞাসা করতে 'পরে বলব, আর একটু দেখি' বলে চুপ করে গেল। এদিকে, দুপুরে ঘুমলেও আমার ঘনঘন হাই উঠছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় একটা ছুঁই ছুঁই করছে।

মাথার বালিশটা ঠিক করে সবে শোবার উপক্রম করছি হঠাৎ তাতন অস্ফুটে চীৎকার করে উঠল, 'নীল কাকু, দেখ দেখ।'

সবিস্ময়ে তিনজনেই জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখি দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো দুলতে দুলতে আরো গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে যাচ্ছে।

নীল কিছু না বলেই টুপ করে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিল। বাগানের অন্ধকারটা ওত পাতা কালো চিতার মত ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলোটা তখনও দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম আলোটা যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে নিশাচরের মত তিনজনেই যখন ভাবছি আলোটা গেল কোথায়? কেউ নিবিয়ে দিল নাকি? ঠিক তখনই আবার আলোটা দেখতে পেলাম। অনেকটা আলেয়ার মত। এই আছে এই নেই। আরো কয়েকবার এই রকম দেখা দেওয়া না দেওয়ার খেলা চলতে চলতে এক সময় সত্যিই আর দেখা গেল না।

কেউই আমরা কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমাদের মুখের অভিব্যক্তিগুলোও অন্ধকারে ডুবে আছে। কতক্ষণ এইভাবে কেটেছিল জানি না হঠাৎ টক্‌টক্‌ করে খুব মৃদু অথচ স্পষ্ট কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম।

নীলই এগিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে এবং একটুও আওয়াজ না করে ফস্‌ করে দরজাটা খুলেই ওর পেনটর্চের বোতাম টিপে দিল।

ফ্যাকাশে আর আতংকগ্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন অনাদিবাবু।

নীলের গলা পেলাম, 'কি ব্যাপার অনাদিবাবু, এত রাত্রে?'

'আমার ঘরটার দিকে বেশ ভালো করে তাকান।'

এখান থেকে অনাদিবাবুর ঘরটা বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। ওনার ঘরে আলোর খেলা চলছে। অনেকটা অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে স্টেজের ওপর আলো যেমন ইলিউশন তৈরী করে সেই রকম।

তাতন বোধ হয় ছুটে বাইরে যাচ্ছিল। নীল খপ্‌ করে ওর হাতটা চেপে ধরল।

সেই নিশ্চল অন্ধকারে নীলের গলা পেলাম, 'কখন আরম্ভ হয়েছে ?'

'জানি না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। খসখসে আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। তারপর—'

'আজকের আলোটা একদম লাল। তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

তাতনের গলা পেলাম, 'নীলকাকু একবার গিয়ে দেখলে হ'ত না ?'

'লাভ নেই। ঐ দেখ আলোটা আর নেই।'

অনাদিবাবুর ঘরের রহস্যময় আলোটা নিভে গেছে। সমস্ত পৃথিবীটা মনে হল কালো রঙের একটা লেপ গায়ে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

আমাদের এ ঘরের আলোটাও নীল ইচ্ছে করেই জ্বালালো না। অন্ধকারেই অনাদিবাবুর গলা শোনা গেল, 'কি হবে ব্যানার্জী সাহেব ?' মুখ না দেখলেও বেশ বুঝতে পারলাম ওঁর গলাটা কাঁপছে। তারপরেই নীলের ভর্ৎসনা শুনলাম, 'ছিঃ অনাদিবাবু, শেষকালে আপনিও হেরে যাবেন নিজের কাছে ?'

'না মানে', আমতা আমতা করেন উনি।

'যান ঘরে ফিরে যান। আজ আর কিছু হবে না।'

'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু না', এবার নীলের গলা বেশ দৃঢ় আর গম্ভীর শোনালো, 'আপনি কি এখনও মনে করেন কোন অশরীরী আত্মা আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে ?'

'আমি তা কোনদিনই বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সব দেখে শুনে—'

'ছেলেমানুষী করবেন না অনাদিবাবু। একটা নির্দিষ্ট ছকেবাঁধা ফর্মুলায় অশরীরী আত্মারা, অবশ্যই যদি থেকে থাকে, ভয় দেখায় না। এ ত' রীতিমত অঙ্কের ফর্মুলা। শুনেছেন কখনো, ভূতে চিঠি লিখে সাবধান করে ? দু-দুবার।'

'সেকি, কি বলছেন আপনি ?'

'হ্যাঁ, আমাকে দুবার সাবধান করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার ভূত আমার এখানে থাকাটা পছন্দ করছে না।'

'কিন্তু আপনার আসার উদ্দেশ্য ত' সবার কাছে লুকনো আছে।'

'অন্তত গোটা দুয়েক হামদো ভূতের কাছে নিশ্চয়ই নেই। অনাদিবাবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এ বাড়িতে কোনদিনও ভূত ছিল না। অন্তত

ভূতেদের এত বিদ্যুৎশক্তি নেই যা দিয়ে রোজ রোজ আপনাকে আলোর খেলা দেখাতে পারে।'

'তাহলে এসব কি ?'

'পরে বলব। তবে জেনে রাখুন এরপর অনেক কিছু বিসদৃশ ঘটনা ঘটতে পারে। কাছে রিভলবার আছে ?'

'না, একটা দোনলা বন্দুক আছে।'

'ওটা পাশে রেখেই শোবেন। আমি যদি ভুল না করে থাকি, খুব শিগগীরই দু একটা মিসহ্যাপ ঘটাও বিচিত্র হবে না। রাত অনেক হল এবার শুতে যান।'

অনাদিবাবু চলে যাবার মিনিটখানেক পরেই 'তোরা বেরোস না, আলোও জবালাস না, আমি আসছি' বলেই নীল ঝোড়ো হাওয়ার মত শোঁ করে বেরিয়ে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পর নীল ফিরে এল। দরজার খিল দিয়ে নিজের বিছানায় চলে গেল। এতক্ষণ ও কোথায় ছিল, কি করছিল কিছুই বলল না। জানি বলবেও না। কেবল পায়ের কাছে জড়ো করা মোটা চাদরটা গায়ের ওপর চাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'কুম্ভকর্ণ ইজ কিল্‌ড্‌।'

আমরা বাকী দুজন অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম 'সে কি ?'

'হ্যাঁ, কাল সকালে খোঁজ নিলেই চলবে। নে এখন ঘুমো।

পরদিন সকালে বেশ হৈচৈ পড়ে গেল। অনাদিবাবুর মুখ কাঁচুমাচু। টমির বয়েস হয়েছিল। যে কোন দিন ও মরেও যেতো। কিন্তু নীলের মুখে 'টমি খুন হয়েছে' একথা শোনার পর থেকেই ভদ্রলোকের মুখটা বেশ কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল। পোষা কুকুর বাড়ির সন্তানের মত। মনটাকে বেশ নাড়া দিয়ে যায়।

নীচের বড় হল-ঘরটায় ঢুকে দেখি টমি কাৎ হয়ে শুয়ে আছে একটা মৌমাছির চাকের পাশে। অজস্র মৌমাছি ওকে ছেঁকে ধরেছে। এক নজরে দেখলেই মনে হবে টমি মৌমাছিগুলোর সঙ্গে বেয়াদপি করাতে মৌমাছিগুলো একযোগে ওদের আক্রমণকারিকে খতম করেছে।

কিন্তু নীল বুঝিয়ে দিল ওকে কেউ গলা টিপে শেষ করে দিয়েছে। এবং যে মেরেছে সে টমির পরিচিত। আর পরিচিত বলেই টমি কোনরকম টুঁশব্দটি না করে তার আততায়ীর কাছে অতর্কিতে মৃত্যুবরণ করেছে।

অনাদিবাবু কোনরকমে বললেন, 'আপনি কি করে এত ডেফিনিট হচ্ছেন ব্যানার্জী সাহেব ? এমনিতেই ত' ওর মরার বয়েস হয়েছিল।'

'সাধারণ মৃত্যুতে আমার কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বুঝবেন গলার কাছের লোমের ওপর রক্তের দাগ। হঠাৎই সাঁড়াশী বা কুকুরধরা আঁকশী দিয়ে ওর গলাটা টিপে ধরা হয়েছিল। মুখের ওপর ভনভন করছে যে মাছি আর মৌমাছি গুলো, ওদের তাড়িয়ে দিলে দেখবেন জিভের পাশ দিয়ে রক্তের দাগ। তবে—

'থামলেন কেন ব্যানার্জী সাহেব বলুন ?'

'কুকুরটা একেবারে বোকার মত মরেনি। হত্যাকারীর একটা চিহ্ন সে মরার আগে সংগ্রহ করেছিল।'

'কি ? কি সে চিহ্ন ?'

'পাড় সমেত একটা কাপড়ের টুকরো। এর বেশী এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।'

'কিন্তু একটা কথা, টমি মৌচাকের কাছে এসে কি করছিল ?'

'ওকে মারা হয়েছে অন্যজায়গায়, দোষটা মৌমাছিদের ঘাড়ে চাপাবার জন্যই এই ব্যবস্থা।'

দেখতে দেখতে ভিড় হয়ে গেলো। তারিণী সেন, রামহরি দত্ত আর নীলমণি পাকড়াশী এসে হাজির। আজ ছুটির দিন না। তাই অন্যেরা আসেন নি।

নীলের উপদেশ মত টমির মৃত্যুর কারণ কারো কাছে প্রকাশ করা হল না। সবাই জানলেন মৌমাছির সম্মিলিত আক্রমণে টমি মারা গেছে। তারিণী সেন ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'তখনি বলেছিলুম, অনাদি, বাড়ির মধ্যে এসব ফ্যাচাং কোর না। শুনলে না ত' ? এখন শখের কুকুরটা গেল।'

সেদিন আর আসর জমল না। কুকুরের শোকে অনাদিবাবু ম্রিয়মাণ। কিছু শুকনো আদিখ্যেতা দেখিয়ে ওঁরা তিনজনেই কেটে পড়লেন। বারোটা নাগাদ মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে টমির বডিটা নিয়ে গেল। অনাদিবাবু কেঁদে ফেললেন হাউ-হাউ করে।

কিন্তু তখনও আমরা বুঝিনি আরো একটা বড় দুর্ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। নীল আগেই বলেছিল 'ইভিল ইজ নকিং এ্যাট দ্য ডোর।'

টমি মারা যাবার পর মাত্র তিনটে দিন কেটেছে। এর মধ্যে তেমন উল্লেখ-

যোগ্য ঘটনা কিছু ঘটে নি। কেবল দ্বিতীয় দিনে আমাদের ঘরে একটা সাপ ঢুকেছিল। তাতন বলেছে, 'ওটা ইচ্ছে করেই ঢোকানো হয়েছে। ভূতের ভয় দেখিয়ে কিছু হল না দেখে সাপের আমদানী করছে।' নীল অবশ্য প্রথমে কিছুই বলেনি কেবল একটু হেসেছিল। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পরে বলেছিল, 'লোকগুলো ভেবেছে আমি ঢোঁড়া সাপ চিনি না।'

কিন্তু ক্লাইম্যাক্স হল তিনদিনের দিন রাত্রে। আর তারপরই সমস্ত কিছুই ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো।

রাত বারোটা সাড়ে বারোটা হবে। আলো নিবিয়ে আমরা শুয়ে পড়েছি। হঠাৎ আলেয়ার আলোটা আবার দেখা দিল। এবারও তাতনেরই নজরে পড়ল প্রথম। আমি আর তাতন অন্ধকার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকলাম। আগের দিনের মতোই অন্ধকারে একটা আলো দুলতে দুলতে গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে যাচ্ছে। কখনও দেখা যাচ্ছে কখনও দেখা যাচ্ছে না।

তাতন ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'জয়কাকু, কি হতে পারে বল ত' ?'

'কি যে হতে পারে বুঝতে পারছি না। জলার ধার হলেও না হয় বোঝা যেত আলেয়ার আলো। সাধারণত পচা জায়গার গ্যাস বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। সেটাকেই আমরা আলেয়া বলি। যেমন ধর জোনাকি। ওদের দেহে 'লুসিফেরিন' বলে একটা জৈব পদার্থ লুকনো আছে। ফলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবার সময় ঐ আলোর আভাটা দেখা যায়। আসলে ওটা ত' আর কোন আগুন না।'

তাতন বলল, 'জোনাকির ব্যাপারটা জানি। কিন্তু এটা কিসের আলো ? একবার মনে হচ্ছে কেউ যেন আলোটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওটা হ্যারিকেন জাতীয় কিছু হতে পারে।'

'কেন মনে হচ্ছে ?' বিছানা থেকে নীলের গলা পেলাম। ভেবেছিলাম ও হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমোয় নি। এমনকি উঠে দেখার মত ইনটারেস্টও দেখালো না।

'ও, তুমি ঘুমোওনি। আলোটা হ্যারিকেনের মনে হচ্ছে এই কারণে যে ওটা একবারও কাঁপছে না। একটা ডিমের মত সেপ্ নিয়ে স্থিরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আলোটা কভারড্ না হলে যেটুকু বাতাস আছে তাতেই ওটা কাঁপত।'

'আলেয়ার আলো হতে পারে না ?'

'আলেয়া আমি কোনোদিনও চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি সেগুলো আগুনের মত জ্বলে। তাছাড়া জয় কাকুত' একটু আগেই বলে দিল। জলার ধারে পচা পাঁকের গ্যাস থেকে আলেয়া তৈরী হয়। কিন্তু ওটাত' জঙ্গল। এবং বেশ পরিস্কার। পচা পাঁক টাঁক ত' নেই। তাই আলেয়া নয়।'

'তাহলে ?'

'আর কিছু মাথায় আসছে না।'

'তোর প্রথম ধারণাটাই ঠিক।'

'তার মানে আলোটা কেউ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ?' এবার আমি বললাম।

'ঠিক তাই ?'

তাতন জিজ্ঞাস করল, 'আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে ?'

'তোদের আর কেউ ভয় দেখাবে না। কারণ তোরা যে চট্ করে ভয় পাবি না এটা আমাদের রহস্যময় বন্ধুটি জানতে পেরে গেছেন। এবার তিনি একেবারে অস্ত্র নিয়েই হাজির হবেন।'

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। বললাম, 'সে কিরে, আমাদের খুন করতেও পারে ?'

'পারে বৈকি। একজনের বাড়া ভাতে তুমি ছাই দেবে আর সে তোমাকে ছেড়ে দেবে ? লোকটা বা লোকগুলো মার্ডার করার রিস্ক নিতে চায় না বলেই ভয় দেখিয়ে বা সাবধান করে আমাদের তাড়াতে চেয়েছিল। তা যখন পারল না তখন মোক্ষম উপায়টি একমাত্র সামনে পড়ে রয়েছে। আমি ত' যে কোন মুহূর্তেই একটা কিছু আশংকা করছি।'

মনে মনে ভাবলাম, সর্বনাশ, নীল এতদূর ভেবে ফেলেছে। একেবারে শেষ আঘাতের জন্য ও প্রস্তুত। এ বিষয়ে কিছু ভাবার আগেই নীল বলল, 'চিন্তা করিস না। আমিও প্রস্তুত। তোরা একটু সজাগ থাকিস। তাতন, হুটহাট কোথাও বেরোস না।'

'সে তোমায় বলতে হবে না কাকু। পেছন থেকে পিস্তল টিস্তল না চালালে চট্‌করে আমায় কাবু করতে পারবে না। সে যাই হোক। আসল কথাটাই চাপা পড়ে যাচ্ছে। তুমি তাহলে বলছ ওটা হ্যারিকেনের আলো ?'

'নিশ্চয়।'

'তার মানে কেউ একজন ওটাকে নিয়ে যাচ্ছে ?'

'যাচ্ছেই ত।'

'কে সে ?'

'সুন্দরী।'

এবার সত্যিই আমি চমকালাম। প্রায় প্রতি রাত্রে সুন্দরী একা একা হাতে লণ্ঠন নিয়ে বনের মধ্য দিয়ে কোথায় যায় ? এ'ত রেগুলার রহস্যময় ব্যাপার। ভূতের ভয় ওর না থাকতে পারে। কিন্তু বাজে লোকজনের ত' অভাব নেই। মেয়েদের পক্ষে এটা বেশ রিস্কি ব্যাপার। তবে কি ওর সঙ্গে এই বাড়ির রহস্যময় ভুতুড়ে ব্যাপারের যোগাযোগ আছে ?

আমার মনের কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলল, 'তোরা এই ভাবছিস ত' মেয়েটা এত রাত্রে কোথায় যায় ? নিশ্চয় ও এই মিস্ট্রির মধ্যে ইনভলভ্‌ড্‌ ? কিন্তু না। মেয়েটা এইসব গণ্ডগোলের মধ্যে নেই।'

'তুই জানলি কি করে ?'

'আমি ত' আরো অনেক কিছুই জানি।'

'যেমন ?'

'যেমন তেমনগুলো এখনও বলার সময় আসে নি। তবে সুন্দরীর ব্যাপারটা বলা যেতে পারে।'

'তাহলে বল না নীলকাকু', তাতন আব্দারের ভঙ্গীতে বলল।

'বলব। তবে আজ অনেক রাত হল। শুয়ে পড়্। সে এক ট্র্যাজিক ব্যাপার।'

নীল মাথায় চাদরটা চাপা দিল। অনেকক্ষণ থেকে মশাগুলো কানের কাছে গান শোনাচ্ছিল। আমি জানি নীল আর একটাও কথা বলবে না। আর রাত না জেগে দুজনে শুয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তচীৎকারে ঘুমটা ভেঙে গেল। বিছানায় ধড়মড় করে উঠে দেখি তাতন আমার আগেই উঠে বসেছে। আর নীল ?

না, ও ঘরে নেই। চট্ করে বিছানা ছেড়ে উঠেই আলোটা জ্বালাতে গেলাম। কিন্তু জানলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সুইচ পর্যন্ত হাত আর এগুলো না। স্পস্ট জানলায় একটা ছায়ামূর্তি। অজান্তেই নিজের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'কে ? কে ওখানে ?'

নিমেষেই স্যাট্ করে মূর্তিটা সরে গেল। কিন্তু তার পরের ঘটনাটার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। পলকের মধ্যে 'এনটার দ্য ড্রাগনের ব্রুস্‌লির' কায়দায় তাতন জানলা দিয়ে নিজের দেহটা অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় গলিয়ে দিল। বাইরে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপর আবার সেই শব্দহীন অন্ধকার।

অন্তত, বেশ কয়েক সেকেণ্ড, আমি কি করব ভেবে পেলাম না। তাতনের পেছন পেছন ছুটে যাব ? না অনাদিবাবুকে ডাকব ? না চীৎকার করব ? ঘরের আলোটা জ্বালানো উচিত হবে কি ? এদিকে নীলই বা কোথায় গেল ? এই অবস্থায় ঠিক কি করতে হয় সেটা ওর মাথায় খেলত বেশী। তাকেই বা কোথায় খুঁজি ? হঠাৎ টর্চের কথা মনে পড়ল। সেটা নীলের বিছানায়। হাতড়ে হাতড়ে ওর বিছানার কাছে গেলাম। নাঃ টর্চ নেই। নিশ্চয় নীল নিয়ে গেছে। যাইহোক বাইরে বেরুনোই ঠিক করলাম। আমার দুজন সঙ্গী ঘরে নেই। এ

অবস্থায় এখানে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না। দরজার খিলটা খুলতে গিয়ে হাতে পড়ল একটা ছিপছিপে বাঁশের কঞ্চি। সেদিন তাতন এটা বাঁশবন থেকে ভেঙে এনেছিল। তাই সই। ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সিঁড়ির প্রথম ধাপে সবে পা রেখেছি, হঠাৎ অন্ধকার কাঁপিয়ে 'গুড়ুম' 'গুড়ুম' দুখানা শব্দ। তারপরই কাঁচা ঘুম ভাঙা পাখিদের সম্মিলিত কিচিরমিচির।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার বুকটা কেঁপে উঠল। ও কিসের শব্দ? পিস্তল? না বন্দুক? কার উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হল? নীলের কাছে পিস্তল আছে আমি জানি। কিন্তু তাতন? খালি হাতে ও ছুটে গেছে একটা ছায়ামূর্তির পেছনে। যদি ওকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছোড়া হয়ে থাকে? যদি ওর বুকে গিয়ে গুলিটা লেগে থাকে? আমি আর ভাবতে পারলাম না। সেই মুহূর্তে তাতনের জন্যে বুকটা হুহু করে উঠল। এই সব ডানপিটে ছেলেরা বাপমাকে বড় কাঁদায়।

তবে পিস্তলের শব্দের সুফলটা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল। অনাদিবাবুর দোতলায় আলো জ্বলে গেছে। ওনার হাতে দোনলা বন্দুক। বন্দুক হাতে নিয়েই উনি দক্ষিণের বারান্দায় এসে চীৎকার করছেন, 'ব্যানার্জী সাহেব কি হল? ও নীলাঞ্জনবাবু, বলি হলটা কি? পিস্তল চালালো কে?'

একটু পরেই নীলের গলা পেলাম বাড়ির পূবদিকের ধেনোজমির মাঠ থেকে, 'আলোগুলো সব জ্বালিয়ে দিন অনাদিবাবু। বড় টর্চ থাকলে সেটা হাতে করে নেমে আসুন।'

যাক্ নীল তাহলে ঠিক আছে। ওর গলার স্বর লক্ষ্য করে বাড়ির পূবদিকের বাগানের উদ্দেশ্যে এগুতে থাকলাম। একটু গিয়েই দেখলাম নীল একজায়গায় মাটির ওপর ঝুঁকে পেন্সিলটর্চটা জ্বালিয়ে কি যেন দেখছে। আমি কাছে যেতেই ও একবার চোখ তুলে দেখে নিয়ে নিজের মনেই বলল, 'এত তাড়াতাড়ি লাশটা ত' বেশীদূরে নিয়ে যেতে পারবে না—'

জিজ্ঞাসা করলাম 'কার লাশ রে?'

সে কথার কোন জবাব পেলাম না। ও ঘাসের ওপর অস্পস্ট ছেঁচড়ানো দাগ লক্ষ্য করে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমিও দেখলাম কয়েকদিন বৃষ্টির ফলে কাদা কাদা ঘেসো জমির ওপর ভারি কিছু টেনে নিয়ে যাবার দাগ। দাগটা ধেনো জমির কাছাকাছি গিয়ে আর পাওয়া গেল না।

নীল সেইখানেই থেমে পড়ল। ওর হাতের স্বল্প আলোর পেনটর্চ। সেই টর্চের আলো অন্ধকার বেশী ভেদ করতে পারে না। সামনের মাঠটা কোমর পর্যন্ত উঁচু ধান গাছে ভরা।

আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই নীল বলল, 'নিশ্চয় বডিটা ঐ ধানগাছের জঙ্গলে পড়ে আছে। তবে বেশী দূরে পড়েনি। যতদূর মনে হচ্ছে এখান

থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দুজন ছিল। পায়ের ছাপগুলো কাল সকালে দেখলেই বোঝা যাবে।'

আমার ধৈর্য আর মানছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে? কে খুন হয়েছে?'

নীল একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল 'সুন্দরী। আগেই আমার আশংকা হয়েছিল এই রকম।'

'অ্যাঁ, বলিস কিরে?'

'আমি ওকে অনেক করে বারণ করেছিলাম। শুনল না। আর আমার পক্ষেই কি সম্ভব ওকে গার্ড দিয়ে রাখা?'

শেষের কথগুলো প্রায় খেদোক্তির মত শোনালো।

'কিন্তু কেন?'

'সে সব অনেক কথা। তবে মেয়েটার অতি সাহসই ওর মৃত্যুটাকে ডেকে আনল।'

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে অনাদিবাবু হাজির। এক হাতে দোনলা বন্দুক। অন্য হাতে টর্চ। টর্চটা জ্বালানোই ছিল। নীল ওনার হাত থেকে টর্চটা নিতে নিতে বলল, 'এখান থেকে থানা কতদূর?'

কাঁপা কাঁপা গলায় অনাদিবাবু বললেন, 'কেন? কি হয়েছে? থানায় আবার কি দরকার পড়ল?'

'আপনার বাগানে এক্ষুণি একটা খুন হয়ে গেছে।'

'অ্যাঁ? তাই বুঝি বন্দুকের আওয়াজ পেলাম?'

'বন্দুক না। পিস্তল। সেটা কেন কি জন্যে বোঝা যাচ্ছে না। তবে খুনটা তার অনেক আগেই হয়েছে?'

'কে? কার কথা বলছেন?'

'সুন্দরী। যদিও আমি আপনার এখানে আসার অনেক আগেই ওর এইভাবে মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু বলা যায় খুনীর দুর্ভাগ্য আমি থাকতেই সে সেটা করে ফেলল। এনিওয়ে, এক্ষুণি থানায় খবর দিতে হবে।'

'এত রাত্রে? কে যাবে?'

'যাকে হোক যেতে হবে। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে গেলে লাশটা আর পাওয়া যাবে না।'

'কিন্তু লাশটা কোথায়?

'আপনার ঐ সামনের ধানক্ষেতে। শম্ভু কোথায়?'

'হুঃ। তাকে কি আর এখন তুলতে পারবেন? গায়ে গরম জল ঢেলে দিলেও তার নেশার ঘুম ছুটবে না।'

'সুন্দরীর মা কোথায় ?'

'নিশ্চই ঘুমোচ্ছে। কিন্তু সুন্দরী বাইরে এলো কি ভাবে ? মা মেয়েতে তো দরজায় খিল দিয়ে শোয়।'

বুঝলাম, প্রায় প্রতি রাত্রেই সুন্দরী লণ্ঠন নিয়ে কোথাও যায় এটা অনাদিবাবু জানেন না।

নীলও ঐ ব্যাপারে কিছু ভাঙল না। কেবল বলল, 'ওর মাকে ত' ডেকে তোলা দরকার ?'

'কিন্তু, হঠাৎই আমি বলে ফেললাম, 'রাত দুপুরে ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে তুলে তার মেয়ের মৃত্যু সংবাদ দেওয়াটা কি উচিত হবে ?'

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল, 'ঠিকই বলেছিস। বেশ কাল সকালেই খবর পাবে। আপনার মালীকে পাওয়া যাবে ?'

অনাদিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ তাকে পাওয়া যাবে।'

'তাহলে ওকেই ডেকে তুলুন। এখান থেকে কি খুব বেশীদূর থানাটা ?'

'না। মাইল খানেক হবে।'

'পাঠিয়ে দিন। অজু সঙ্গে যা। দারোগাকে সব খুলে বলবি।'

'আমি যাব কি করে ? এদিকে ত' আর এক কেলেঙ্কারী। তাতনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ?'

'অ্যাঁ,' অনাদিবাবু যেন আৎকে উঠলেন, 'কি বলছেন কি অজেয়বাবু ? তাতনকে পাওয়া যাচ্ছে না আর আপনি এতক্ষণ সে কথাটা বলেন নি ?'

'বলব কি। নীলের গলার আওয়াজ পেয়ে এখানে এসে দেখি এই অবস্থা—'

'নাঃ ছেলেটা আমায় পাগল করে দেবে।' বলেই অনাদিবাবু এলোমেলো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। নীলই বলে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছেন অনাদিবাবু ?'

'খুঁজে দেখি। পিস্তলের আওয়াজ হয়েছিল দু দুটো মনে নেই ?'

অনুত্তেজিত নীল মৃদু হাসতে হাসতে বলল, 'প্রায় মিনিট পনের আগে দুটো পিস্তলের আওয়াজ হয়েছিল। যদি কিছু হয়ে থাকে এতক্ষণ পর আপনি সেখানে গিয়ে কি করবেন ? এক কাজ করুন, আপনি আর অজু এখানেই থাকুন। মনে হয় না আপনাদের ওপর আর হামলা হবে। আমিই খুঁজে দেখছি। আর ব্যস্ত হবার দরকার নেই। মালীকে আমিই খবরটা দিয়ে দেবো।'

নীল আর অপেক্ষা করল না। হন হন করে সামনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ওর যাওয়ার গতি দেখেই বুঝলাম মুখে আমাদের যাই বলুক তাতনের জন্যে ভেতরে ভেতরে ওর অস্থিরতা সমুদ্রের ঢেউ এর মত।

পুলিস যখন এলো পুবের আকাশটা তখন ফর্সা হয়ে আসছে। গতরাতে একটা খুন হয়ে যাওয়া ভয়ংকর রহস্যময় মল্লিক বাড়ির বাগানটা ক্রমশ সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। এতক্ষণ আমি আর অনাদিবাবু পালা করে দাঁড়িয়ে বসে জায়গাটা পাহারা দিয়েছি। আর মাঝে মাঝে যেহেতু দুজনেই সমান সাহসী, এবং অনাদিবাবুর হাতে দোনলা বন্দুক থাকা সত্ত্বেও, উদ্বেগ আর আশংকা নিয়ে একবার ধানক্ষেত আর একবার কালো জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কে জানে, নীল যতই আশ্বাস দিয়ে যাক, দুম করে একটা পিস্তলের গুলি অদৃশ্য আততায়ীর হাত থেকে ছিটকে এলে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতো। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে কিছুই হয় নি। রাতটাও ভোর হয়ে এল। সব থেকে বেশী আশ্বস্ত হলাম ওদেরকে আসতে দেখে।

দুজন কনস্টেবল আর একজন দারোগার সঙ্গে বাগানের মালী রয়েছে। আর ওদের ঠিক পেছনেই নীল আর তাতন। তাতনকে দেখে সব থেকে বেশী অনাদিবাবুর কালো মুখটা পরিষ্কার দেখালো। মেঘ কেটে গেলে যেমন চারদিকে উজ্জ্বল দেখায় ঠিক সেই রকম।

দারোগাবাবু এসে প্রথমেই খানিকটা হৈচৈ চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন। এটাই ওঁদের স্বভাব। অযথা হাঁকডাক করা। অনাদিবাবুকে ধমকালেন। আমি নীল তাতনও বাদ গেলাম না। মালীটা ত' ঠ্যাঙানী খেতে খেতে বেঁচে গেল।

বুঝলাম কেন ওঁর এই উগ্রমূর্তি। নিশ্চয়ই নীল কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে তুলে এনেছে।

শেষপর্যন্ত নীলের অনুমানই ঠিক হল। ধানক্ষেত থেকেই সুন্দরীর বাডিটা পাওয়া গেল।

সুন্দরীর মুখটা দেখে চমকে উঠলাম। মনেই হয় না ও মারা গেছে। তাজা টসটসে মুখ। চমকটা ছিল অন্য জায়গায়। টমির মুখটা মনে পড়ে গেল। জিভটা বেরিয়ে এসেছিল। আর জিভে রক্ত। সুন্দরীরও তাই। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ওরও জিভটা দেখা যাচ্ছে। কষের গায়ে তাজা রক্তের দাগ। আধা-বুজনো চোখের কোনে শুকনো রক্ত। আর, হ্যাঁ আমি স্পষ্টই দেখলাম সুন্দরীর

গলায় সাঁড়াশীর দাগ। কালসীটে পড়ে আছে। অর্থাৎ দুটো মৃত্যুই একই ভাবে ঘটেছে।

একটু পরেই বাড়ির সব লোক জেগে উঠল। সব বলতে শম্ভু আর সুন্দরীর মা। সুন্দরীর মা-ই সারা অঞ্চলকে জানিয়ে দিল যে তার মেয়ে খুন হয়ে মারা গেছে। দেখতে দেখতে, যতই ফটক থাক, আর পাঁচিল থাক, গ্রামের ব্যাপার, একজন দুজন করে ভিড় বেড়ে চলল।

ওখানে থাকা অর্থহীন মনে করেই নীল বলে উঠল, 'তাহলে দারোগাবাবু, আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।'

দারোগাবাবুর এতক্ষণে যেন হুঁশ হল, ভোরের আলোয় একবার আপাদমস্তক নীলকে দেখে নিয়ে বললেন, 'ও, হ্যাঁ সন্দেহজনক। আপনিই ত' আমাকে ডাকাডাকি করে নিয়ে এলেন। কিন্তু আপনি মশাই লোকটা কে হ্যাঁ! এ তল্লাটে ত' এর আগে দেখিনি। কি অনাদিবাবু, এ লোকটা ক্যা?'

অনাদিবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, 'উনি আমার বিশেষ পরিচিত। কদিন আমার বাড়িতে থাকবেন বলে এসেছেন।'

'সন্দেহজনক। বাড়িতে নতুন লোক এল আর সঙ্গে সঙ্গে খুন? কোথায় থাকা হয়?'

খুব অসভ্য এবং অভদ্র ধরনের কথাবার্তা। আমি হলে রেগে যেতাম কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সংগে নীল বলল, 'আজ্ঞে কলকাতায়।'

'অ, কলকাতায়। সন্দেহজনক। এ খুনের হিল্লে না হওয়া পর্যন্ত পুলিসের বিনা অনুমতিতে স্টেশন লীভ করবেন না।'

নীলের গলা দিয়ে তখন বিনয়ের ক্ষীর ঝরছে, বলল, 'না দারোগাবাবু, আমারও তেমন ইচ্ছে নেই। খুনের হিল্লে না হওয়া পর্যন্ত আমাকে থাকতেই হবে।'

'সেটা আমরা বুঝব খুনের হিল্লে হল, কি না হল। যান এখন গিয়ে চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকুন। ডাকলেই যেন সাড়া পাই। এ লোকটা কে?'

বলাবাহুল্য আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। আমার ত' কানটান গরম হয়ে উঠেছিল। মুখ দিয়ে অন্য রকম একটা কিছু বেরুতে যাচ্ছিল।

নীল আমার হাতটা টিপে দিয়ে বলল, 'আজ্ঞে স্যার, উনি আমার বন্ধু।'

'খুবই সন্দেহজনক। একে উটকো লোক। তায় আবার সংগে বন্ধু। আপনিও স্টেশন লীভ করতে পারবেন না। আপনাদের ঠিকানাটা বলুন ত'। ভাঁড়াবেন না কিন্তু, ধরে ফেলব।'

অনাদিবাবু বোধহয় আর থাকতে পারলেন না। এগিয়ে এসে বললেন, 'অযথা ওঁদের কটুকথা বলবেন না দারোগাবাবু। ওনাদের জন্যে আমি জামিন রইলুম।'

'সে ত' থাকতেই হবে। তবে ঠিকানাটা আমার দরকার।' বলেই পকেট থেকে ছোট ডায়েরী আর ডট্‌পেনটা বার করলেন।

নীল বলল, 'কষ্ট করে লেখার দরকার নেই স্যার। এই কার্ডটায় আমার ঠিকানা লেখা আছে। ফল্‌স্ না। মিলিয়ে নেবেন।'

দারোগাবাবুর সঙ্গে আর একটাও কথা না বলে নীল আমার হাতে টান দিল। তারপর 'চল অজু' বলেই হন্‌হন্ করে গেস্ট হাউসের দিকে এগিয়ে গেল।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিল তাতন, 'উঃ নীল কাকু, তুমি ত' চলে এলে, তোমার কার্ডটা পড়ার পর দারোগাবাবুর মুখটা যদি দেখতে, একেবারে বেলুন ফটাস্।'

নীল মুখ টিপে হাসছিল। গতকাল কারোরই আমাদের সারারাত ঘুম হয়নি। ও এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। আমার আর তাতনের ঘুম অনেকক্ষণ আগেই ভেঙেছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বিকেল প্রায় চারটে। এই সময় হঠাৎই সুন্দরীর কথা মনে পড়ে গেল। গতকাল গভীর রাত্রে ও খুন হয়েছে। ও বেঁচে থাকলে এতক্ষণে আমাদের চা-টা এসে যেত। এখন কেই বা কি করে। এ কলকাতা শহর না। দু পা হাঁটলেই যে কোন একটা রেস্তোরাঁ পাওয়া যাবে। অনাদিবাবু বেশ আপসেট হয়ে পড়েছেন। এখন চায়ের কথা বলে পাঠানো মানেই ওনাকে বেশ বিব্রত করা। একমাত্র ভরসা শম্ভু।

চা না পেয়ে নীলেরও ঘনঘন হাই উঠছিল। ও অবশ্য সব অবস্থাই মানিয়ে নিতে পারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে টানতে শুরু করল।

তাতনের হাসির রেশ তখনও থামে নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'দারোগা ভদ্রলোক তারপর কি করলেন?'

'কিছুক্ষণ তোমাদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওনার মোটা-মোটা ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তারপর ওনাকে বলতে শুনেছিলাম, 'যাঃ শালা।'

তাতনের কথা তখনও শেষ হয় নি। দরজায় একটা চেনা গলার শব্দ শুনলাম, 'আসতে পারি স্যার?'

'আরে আমার কি সৌভাগ্য। আসুন, আসুন স্যার', বলেই নীল ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার কাছে চলে গেল, 'আবার কেন কষ্ট করে এলেন, আমায় খবর পাঠালেই হত।'

'আর আমায় অপরাধী করবেন না স্যার' বলেই দারোগাবাবু কাঁচুমাঁচু মুখে এগিয়ে এসে নীলের এগিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসলেন।

'না না, এ সব কি বলছেন ? আপনি ত' আপনার কাজই করেছেন।'

'করিনি স্যার। একদম করিনি। না চিনে বড় অভদ্র আচরণ করেছিলুম। ক্ষমা করে দিন স্যার।'

'এভাবে কথা বলে আপনি কিন্তু আপনার ইউনিফর্মের অসম্মান করছেন দারোগাবাবু।'

'আমার নাম সুকান্ত স্যার। সুকান্ত দাস। আপনি আমাকে সুকান্ত বলেই ডাকবেন।'

'তা কি হয় ? বয়েসটাকেও ত' সম্মান দেওয়া উচিত।'

'তা হলে দাস।'

'ঠিক আছে মাঝামাঝিই থাক। দাসবাবু বলা যাবে, কেমন ? তা কেসটা কেমন বুঝছেন ?'

'কিছুই বুঝিনি স্যার। আপনার কাছে মিথ্যে বলব না। এ সব খুন-খারাপী আমার মাথায় ঢোকে না।'

'সেকি ? আপনি নিশ্চয় অনেকদিনই পুলিসে কাজ করছেন ?'

'করছি। করতে হয় বলে। কিন্তু বিশ্বাস করুন এ লাইন আমার নয়। বি. এস. সি. পাশ করে ভেবেছিলুম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব। ছোট থেকেই আমার কারিগরী ব্যাপারটার ওপর বেশ ঝোঁক।' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দাসবাবু বললেন, 'হল না স্যার। আমার মেসোমশাই ছিলেন জাঁদরেল পুলিস অফিসার। ঢুকিয়ে দিলেন পুলিসে। কিন্তু এ লাইনে কিছু করতে গেলে একটা এলেমের দরকার। ওসব আমার নেই। হলও না কিছু। খুন-খারাপী দেখলে এখনও আমার নার্ভ আল্‌গা হয়ে যায়।'

ফস্ করে তাতন বলে উঠল, 'তাই বুঝি অত চেচাঁমেচি করেন ?'

'ঠিক বলেছ ভায়া। আমার থানার পাশে একটা চায়ের দোকান আছে। চাওলা ছোকরা এক পোয়া দুধে কম করেও এক লিটার জল মেশায়। ঐ দুধে চায়ের রঙ হয় চিরতা ভেজানো জলের মত। কিন্তু ছোকরা সেটা চাপা দেয় গরম চিরতার জলের ওপর খানিকটা দুধের সর ফেলে দিয়ে। আমার হম্বিতম্বিটা ঐ সরের মত—। ভেতরে কিছু নেই স্যার।'

ভদ্রলোকের অবস্থা করুণ। দাসবাবুকে প্রথমে যতটা অভদ্র ভেবেছিলাম

এখন দেখলাম সেটা তাঁর মুখোশ। ভেতরের লোকটা ছাপোষা। এ লাইনের দস্তুর হিসেবে মারপ্যাঁচটা কিন্তু কম। তবু নীল ওনার দীনতা চাপা দেবার জন্যে বলল, 'এসব কথা বাইরের লোকের কাছে বলা কি উচিত হচ্ছে দাসবাবু ?'

'হচ্ছে, একশবার হচ্ছে। আপনি বাইরের লোক কে বলল ? আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে চিনি। আপনি সত্যেনদার শালা না ?'

'হ্যাঁ তাইত, কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কি করে ?'

'পুলিস অফিসার সত্যেন মুখার্জীর আণ্ডারে আমি বহুদিন ছিলুম। উনি আমাকে স্নেহ করতেন বলেই চাকরিটা টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছি। আর আপনি মিঃ মুখার্জীর শ্যালক সেটা জানলুম খবরের কাগজ থেকে। আপনার বন্ধু সমুদ্র গুপ্তের মার্ডার কেসটা যেভাবে সল্‌ভ্‌ করেছিলেন, সত্যি মশাই, আপনার যা বুদ্ধি, ভাবা যায় না।'

'কিন্তু, কলকাতা ছেড়ে এলেন কেন ?'

'অপকর্মের ঢেঁকিদের আরো অজ পাড়াগাঁয়ে ঠেলে দেয়। আমাকে ত' তবু পলাশমায়ার মত জায়গায় পাঠিয়েছে। সেও মিঃ মুখার্জীর দৌলতে। আমার স্ত্রীও বলেন—আমার নাকি পুলিসে আসা ঠিক হয় নি, মুরগীর ব্যবসা করা উচিত ছিল। তবে আমি জানি, সেটাও আমার দ্বারা হত না। আসলে এ সব আমার লাইনই নয়।'

চা এসে গিয়েছিল। অনাদিবাবু জানতে পেরেছিলেন দাসবাবু এসেছেন। চার কাপ চা আর বিস্কিট নিয়ে শম্ভু এসে ঘরে ঢুকল—। নিমেষে দাসবাবুর মুখের ভাব পাল্টে গেল। শম্ভুকে দেখে উনি খ্যাঁক করেউঠলেন, 'সন্দেহজনক। সকাল বেলায় হাজার প্রশ্ন করেও এ লোকটার মুখ থেকে একটাও মনের মত কথা বার করতে পারিনি।'

নীল একটু হাসল। মুখে কিছুই বলল না। ওর দৃষ্টি ছিল শম্ভুর দিকে। শম্ভু চা বিস্কিট রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে নীল বলল, 'এবার বলুন দাসবাবু, সকালে জেরা-টেরা করে কিছু পেলেন ?'

'নাথিং স্যার। নাথিং। জেরা বলতে ত' এই ক'টি প্রাণী। এই গেঁয়ো লোকটা, বাগানের মালীটা আর যে মেয়েটা মরেছে তার মা। অবশ্য অনাদি-বাবুও আছেন। জিজ্ঞেস করবটা কি ? যাকেই যা জিজ্ঞেস করি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর বলে রাত্তিরবেলা, ঘুমুচ্ছিলুম। কিছুই জানি না। আর মেয়েটার মা ত' কেঁদেই ভাসিয়ে দিল। অনাদিবাবুও বলছেন আপনার ডাকাডাকিতে নাকি ওনার ঘুম ভাঙে।'

'হুঁ। পি. এম রিপোর্টটা আসবে কখন ?'

'কাল সকালের মধ্যেই পাওয়া যাবে।'

'এলে একটু দেখাবেন।'

'সে আর বলতে ? আমি একটা জিনিস ভাবছি স্যার, মেয়েটা অত রাত্রে বাগানে কি করছিল ? আচ্ছা ওকে কেউ খুন করে বাগানে ফেলে দিয়ে যায় নি ত ?'

'নাঃ। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সুন্দরী বাগানেই খুন হয়েছে ?'

'কিন্তু কেন ? কোন ইল্লীগ্যাল কিছু নেই ত ?'

'খুনটাই ত ইল্লীগ্যাল। আর সেইটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। আচ্ছা দাসবাবু, আপনি কিছু ধারণা করেছেন, কিভাবে, আই মিন্ কি দিয়ে মেয়েটাকে খুন করা হয়েছে ?'

'আমার মনে হয় কোন শক্ত লোহার কিছু দিয়ে মেয়েটার গলা টিপে ধরা হয়েছিল ?'

'ইউ আর কারেক্ট। জিনিষটা সাঁড়াশী হতে পারে ?'

'হতে পারে, কিন্তু অতবড় সাঁড়াশী ?'

'কেন ? পাগলা কুকুর বা শিয়াল ধরার জন্যে যে সাঁড়াশী ব্যবহার করা হয় সেগুলো ত' বেশ বড়ই।'

'ঠিক বলেছেন স্যার। এদিকটা ত' আমি একবারও ভাবিনি। কিন্তু অতবড় সাঁড়াশী লুকলো কোথায় ? পেলোই বা কি করে ?'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নীল বলল, 'আর একটা জিনিস কি লক্ষ্য করেছেন দাসবাবু, যন্ত্রটার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে।'

'বিশেষত্ব ? কি রকম বলুন ত' ?

'সাধারণত কুকুর বা শেয়াল ধরার জন্যে যে সাঁড়াশী ব্যবহার করা হয় সেগুলো দিয়ে মানুষের গলা বেড় দিয়ে ধরার অসুবিধা আছে। কারণ মানুষের গলা পশুর থেকে একটু সরু। তারপর কুকুর শেয়াল ধরার জন্যে যে সাঁড়াশী ব্যবহার করা হয় সেগুলোর মধ্যে কোন হুকের ব্যবহার নেই। এক্ষেত্রে তা আছে। সাঁড়াশীর ভেতর দিকে নিশ্চয়ই কোন পয়েণ্টেড ধারালো হুক আছে।'

'কি করে বুঝলেন ?'

'বোথ দ্য কেসেস' এটাই প্রমাণ করছে। মেয়েটির গলার নলিটা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ছিল মনে আছে ?

'আছে।'

'টমির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।'

'টমিটা কে ?'

'আপনাকে বলা হয় নি, কয়েকদিন আগে অনাদিবাবুর পোষা এ্যালসেসিয়ান কুকুরটা একই ভাবে খুন হয়। তারও গলায় কণ্ঠনালিতে দুখানা ফুটো পাওয়া গিয়েছিল।'

'সন্দেহজনক।'

'হ্যাঁ, সত্যিই সন্দেহজনক।'

'তার মানে দুটো খুন একজনই করেছে।

'ঘটনা ত' তাই বলছে।

'কিন্তু এদের হত্যা করে কি লাভ হল ?'

'আপাতত সেটা আমার থেকে খুনীই ভালো বলতে পারবে। এনিওয়ে, দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।'

বুঝলাম নীল এই দুটো খুনের ব্যাপারে দাসবাবুর সঙ্গে আর কোন কথা বলতে রাজী নয়। দাসবাবু কিছু বুঝলেন কিনা জানিনা তবে উনিও উঠে পড়লেন, 'আজ তাহলে আমি চলি স্যার।'

'হ্যা আসুন। আপনার ত' আবার থানার অন্য অনেক কাজ আছে।'

'আর বলেন কেন ? কদিন থেকে এমন ছিঁচকে চোরের উৎপাত হয়েছে। এ জঘন্য পুলিসের কাজ আর ভাল্লাগে না মশাই। রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেলে বেঁচে যাই। বৌ এর হাত ধরে তীর্থ করতে বেরিয়ে যাব।'

'আপনার ছেলে মেয়ে কটি ?'

'আজ্ঞে দুটি। মেয়েটি বড়। বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে। ছেলেটি এবার হায়ার সেকেণ্ডারী দেবে।'

দাসবাবু চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়লেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মিঃ ব্যানার্জী একটা অনুরোধ করব ?'

'অত কুণ্ঠা কেন ? নিশ্চয় করবেন।'

'আপনি কি চলে যাবেন ?'

'তবে কি চিরদিন এখানে থাকব ?'

'না তা নয়। মানে বলছিলুম কি, আপনি থাকলে একটু ভরসা পাই। মানে বুঝলেন ত' এই খুনের পুরো চার্জ আমার ওপর। আপনার জামাইবাবু জীবনে আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। সে ঋণ আমি কোনদিনও ভুলবনা'

নীল ওঁকে থামিয়ে দিল, 'দাসবাবু আপনাকে বোধ হয় বলা হয় নি। এখানে আমার আসার একটা উদ্দেশ্যে ছিল। একটা রহস্যের সমাধান করা।'

'রহস্য ? সন্দেহজনক ! কি রহস্য স্যার ?'

'সে আছে একটা। সে রহস্য প্রায় সমাধান করে এনেছিলাম। দু একদিনের মধ্যে চলেও যেতাম। হঠাৎ দু দুটো খুন। অ্যান্ড আই অ্যাম সিওর, আমার

রহস্যের সঙ্গে এই দুটো খুনের যোগাযোগ আছে। তাই আপনি না বললেও আমার পক্ষে এত ইনটারেস্টিং মাথার কাজটি ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করব। কৃতকার্য হলে ক্রেডিটটা আপনাকে দিতে আমার আপত্তি নেই।'

বিনয়ে গলে পড়লেন ভদ্রলোক। সম্ভব হলে পায়ের ধুলোও নিয়ে নিতেন। 'গদগদ' হয়ে বললেন, 'না না অতটা আমি চাই না, আমার এলাকার এই খুনের সমাধান হোক এটাই আমার একমাত্র কাম্য। সমাধান হলে ক্রেডিট যেই পাক, 'ডিসপিউটেড মার্ডার কেস' আমার পক্ষে চরম ডিসক্রেডিট স্যার। আপনি না সাহায্য করলে—'

'আপনি থানায় যান দাসবাবু—আমি ত' আপনাকে কথা দিয়েছি।'

'বাঁচালেন স্যার' বলেই দাসবাবু চলে গেলেন। মাঝারি মাপের গোলগাল চেহারার শান্তিপ্রিয় লোকটা ভাগ্যের পরিহাসে এক বিপজ্জনক জীবিকা নিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। এর থেকে ট্রাজেডি আর কি থাকতে পারে। ওঁর জন্যে সত্যিই এই মুহূর্তে আমার বেশ কষ্ট লাগল।

দাসবাবু চলে যাবার পর ঠিক চারটে নাগাদ নীল বলল, 'চল্ একটু বেরিয়ে আসি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। অবেলার দিবানিদ্রা।'

তাতন বলল, 'কোথায় যাবে নীলকাকু ?'

'চল্ না, বেড়াতে বেড়াতে গঙ্গার ধারটাই ঘুরে আসি।'

কাঁচা মেঠো রাস্তা ধরে তিনজনে হাঁটছি। খুব একটা কথাবার্তা কেউই বলছিলাম না। নীলের কোঁচকানো ভ্রু সোজাই হতে চায় না। এ রহস্য সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ঐ রকমই থাকবে। তাতন কি ভাবছিল কে জানে। কিন্তু আমার মনে অনেক প্রশ্ন।

সন্ধ্যে নেমে আসছে। গা শিরশিরে হাল্কা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। গরম জামাকাপড় আনা হয় নি। অনাদিবাবু আমাদের তিনজনকে তিনখানা তুষের দিয়েছিলেন। সকাল সন্ধ্যের ঠাণ্ডাটা অবশ্য ওতেই কাটানো যায়।

না করে গায়ের চাদরটা মুড়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেটের কানো ধোঁয়ার মত আমার মনে কতগুলো প্রশ্ন ভীষণ পাক ম প্রশ্ন কাল রাত্রে কে আমাদের জানলার কাছে এসেছিল ? যেই

আসুক, সে কি উদ্দেশ্যে এসেছিল ? তাতন ওকে ফলো করতে জানলা দিয়ে লাফিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরতে পারে নি। কারণ লোকটা ওকে লক্ষ্য করে পরপর দুটো পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে। তারপর সেই পুরনো মন্দির দিয়ে ওপাশের বাঁশবনে ঢুকে পড়ে। তাতন বাধ্য হয়েই অনেকটা পেছনে ছিল। বাঁশবনে পৌঁছে ও আর কাউকে দেখতে পায় নি। তবু হাল ছেড়ে দিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসেনি। বাঁশবনে লুকিয়েছিল। যদি লোকটা আবার ফিরে আসে। অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর নীলকে আসতে দেখে ও বাঁশবন ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এখানে আমার প্রশ্ন তাতনকে লক্ষ্য করে কে গুলি ছুঁড়েছিল ? যেই ছুঁড়ুক হাতের টিপ তার পাকা না। কারণ দুটো গুলির একটাও ওর ধার কাছ দিয়ে যায় নি। অর্থাৎ আনাড়ি লক্ষ্যের পিস্তলের মালিক কে আছে এখানে ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন সুন্দরীকে মারা হল কেন ? নীলের পুরনো একটা থিওরির কথা মনে পরল। ও বলেছিল কোন রহস্যের সমাধান করতে গেলে তিনটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবি। উত্তর পেলে দেখবি জট খুলে গেছে। সেটা হল এইচ্, ডাবলিউ, ডাবলিউ। এইচ মানে হাউ ? অর্থাৎ কেমন করে ? এখানে হাউটা বোঝা গেছে। একটা বিচিত্র ধরনের সাঁড়াশি দিয়ে দুটো খুনই করা হয়েছে। নীল আরো বলেছিল অস্ত্রের ক্যারেকটার অনেক সময় খুনীর চরিত্র বুঝিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে কি ধরব ? এই ধরনের সাঁড়াশি কারা ব্যবহার করে ? মিউনিসিপ্যালিটির 'প্রোটেকশান এগেনস্ট ওয়াইল্ড অর আন-সেফ্‌টি বীস্‌ট্‌' ডিপার্টমেন্টে যারা পাগলা কুকুর শেয়াল ধরে তারাই এই সাঁড়াশি ব্যবহার করতে অভ্যস্থ। তাহলে কি এই দুটো খুন যে করেছে সে ঐ রকম কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে ? এখানে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাদের মধ্যেই কি কেউ আছে ? কে জানে ?

এরপর আসছে ফার্স্ট্ ডাবলিউ। অর্থাৎ হোয়াই ? অর্থাৎ মোটিভ ? সুন্দরী একটা সাধারণ ঝি। তাকে মারার কি উদ্দেশ্য ? একটা গরীব গ্রাম্য ঝি শ্রেণীর কোন মেয়েকে অর্থের কারণে খুন করা যেতে পারে না। নিশ্চয়ই অন্য কারণ। তবে কি সে কারো কোনো স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ? এ চিন্তাটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তারপর নীল বলল অনাদিবাবুর বাড়ির ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার সঙ্গে টমি এবং সুন্দরী হত্যার যোগাযোগ আছে। কি সে যোগাযোগ ?

আর সেকেণ্ড ডাবলিউ ? মানে হু ? অসম্ভব। তাহলে ত' আমিই নীল ব্যানার্জী হয়ে যেতাম। ভাবতে ভাবতে আর হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন সেই শ্মশানের ধারে চলে এসেছিলাম। এবার আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম

বলে সেদিনের দূর থেকে দেখা বটগাছটা সামনে পড়ে গেল। বটগাছ থেকে অন্তত পঞ্চাশগজ দূরে এসে নীল দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আপনমনেই বলল, 'যাক। লোকটা আছে।'

'কে? কার কথা বলছিস?'

'ঐ যে দূরে বটগাছের নীচে একটা লোক বসে আছে। হাঁটুর ওপর মাথা গুঁজে। খবরটা তাহলে পেয়ে গেছে।'

থাকতে না পেরে বলে উঠলাম 'কি বকছিস আপন মনে? কিছুই ত' বুঝছি না?'

'বুঝবি। একটু পরেই। পা চালা।'

কিন্তু খানিকটা এগোতেই কান্নার আওয়াজ পেলাম। দিনের আলো তখনও কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। সেই আলোয় দেখলাম লোকটার পায়ের ওপর মাথা রেখে একজন মহিলা সমানে কেঁদে চলেছে। আর একটু এগিয়ে বুঝতে অসুবিধা হল না যে কাঁদছে সে সুন্দরীর মা। কিন্তু লোকটা কে? সুন্দরীর মা এখানে এসে ওর পায়ের ওপর মাথা রেখে কাঁদছে কেন?

তাতন আমার পাশে পাশে হাঁটছিল। ফিসফিস করে বলল, 'জয়কাকু, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কি ব্যাপার বলতো?'

আমি বললাম, 'ব্যাপার আমার বন্ধু নীলবাবু জানেন আর ওরা দুজন জানে।'

নীল নির্বিকার। ও ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু ঘুরে বটগাছটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। আমরাও তাই করলাম।

সুন্দরীর মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, 'ওগো, তুমি বল না, আমি এখন কাকে নিয়ে থাকব? আর যে আমার কিছুই রইল না গো।'

হঠাৎ সিমেন্টের বেদীর ওপর ঢিপ ঢিপ আওয়াজ। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম সুন্দরীর মা সেই বাঁধানো বেদীর ওপর মাথা ঠুকছে।

এতক্ষণ পর লোকটাকে মাথা তুলতে দেখলাম। একমুখ কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ি। মাথার চুলগুলোও অযত্ন বর্ধিত। কোথায় যেন এই মুখ আমি দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই এ মুহূর্তে মনে এল না। লোকটার চোখেও জল। বোধ হয় ও সারাক্ষণই কেঁদেছে। চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করে সুন্দরীর মায়ের কপালের নীচে হাতটা পেতে দিল। তারপর ওকে বলতে শুনলাম, 'অমন করিস না সরলা। তোর যে মাথাটা ফেটে যাবে?'

'তা থাক। আর আমার বাঁচার সাধ নেই গো! ওঃ ভগবান, কি পাপ করেছিলুম শেষকালে মেয়ের মরামুখ দেখতে হল—।'

তারপর ফের কিছুক্ষণ চুপচাপ। লোকটাকে ফের বলতে শুনলাম 'সরলা,

এখনও আমার কথা শোন্। চ আমরা এখেন থেকে চলে যাই। আর কোন্ আশায় এখেনে পড়ে থাকবি। একমাত্র বন্ধন যা ছেল তাও ত' গেল—'

সরলা তখনও কেঁদে চলেছে। লোকটা ওর মুখটা তুলে নিজের গেরুয়া কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'সবই অদেষ্ট, তুই আমি কিছুই করতে পারি না। ইস্ কপালটা কি করলি বলদিকিনি। একদম ফুলে গেছে। দাঁড়া, এট্টু ন্যাকড়া ভিজিয়ে আনি।'

পাশেই গঙ্গা। লোকটা যেই পা বাড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তাতন প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল, 'নীলকাকু'

নীল বোধহয় তৈরী ছিল। তাতনের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বলল, 'চ, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

'কিন্তু'

'চ, যেতে যেতে বলব সব।'

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। আগের পথ দিয়েই তিনজন ফিরছিলাম। রাস্তা ফাঁকা। পাশের কুল আর বাবলা গাছের ঝোপে জোনাকিগুলো পিটপিট করে জ্বলছিল। দূরে কিছু কিছু মাটির ঘরে বৌঝিরা সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়েছে। শাঁখের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে নীল বলল, 'সুন্দরীকে একটা কাহিনীর ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার বলা যেতে পারে। যদিও বৃহত্তর কারণে না তবুও একটা সংসারের জন্যে ও নিজেকে বলি দিল।'

রেগে গিয়ে বললাম, 'ভালো করে খুলে বল, কিছুই বুঝছি না।'

'যে লোকটাকে এখুনি দেখলি, ওকে চিনতে পেরেছিস ?'

তাতনই বলল, 'হ্যাঁ, ওই ত' সেই লোকটা। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে জেঠুর বাড়িটা দেখছিল। যার একটা পায়ের আঙুল কাটা আর পা টেনে টেনে চলে।'

'ঠিক। লোকটার বাঁ পায়ের চারটে আঙুল, মানে একটা কাটা। আর লোকটা সেই পা টেনে টেনে চলে। ঠিকই, লোকটা সেদিন মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে তোর জেঠুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু বাদবাকি সব ঠিক না। অর্থাৎ তোদের বোঝায় ভুল থেকে গেছে।'

'কেন ?'

'লোকটা একটা কারখানায় কাজ করত। একদিন অসাবধানে কাজ করতে করতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। তাতে লোকটার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল বাদ দিতে গিয়ে আঙুলের সোজা প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত অ্যামপুট্ করতে হয়। হয়ত পুরো পাটাই অ্যামপুট করতে হত। বরাত জোর বেঁচে গেছে। তবে বাঁ পায়ের জোর কমে যায়। হয়ত কিছু নার্ভও শুকিয়ে গিয়েছিল। আর সেই জন্যেই লোকটাকে বাঁ পা টেনে চলতে হত। লোকটা সেদিন মাঠে গিয়েছিল কারণ সুন্দরীর তার আগে তিন চার দিন ধরে জ্বর হয়েছিল। লোকটার সঙ্গে তিন চার দিন দেখা করতে পারে নি। তাই সেদিন বাগানে গিয়েছিল সুন্দরীর খোঁজ নিতে।'

'কিন্তু দূরবীন ?'

'ওটা তোদের দেখার ভুল। লোকটা জীবনে কোনদিনও দূরবীনে চোখ রাখে নি। অনেক সময় আমরা দূরের কোন জিনিস দেখতে গেলে হাতটা পাকিয়ে চোখের সামনে রাখি। ও সেই রকমই করেছিল। তোরা ভেবেছিলি দূরবীন।'

'কিন্তু,' তাতন বলল, 'লোকটাকে যে একবার দেখা যাচ্ছিল আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।'

নীল হেসে উঠল, 'দূর বোকা, তা কখনও হয়। ওটা সিম্‌পলী তোদের সাবকন্‌সাস মাইণ্ডের রিঅ্যাকশান। বাইরে আমরা যতই সাহস দেখাই না কেন ভেতরে আমাদের একটা ভীতু মন লুকিয়ে থাকে। সে আমাদের সর্বদাই বিপদের ঝুঁকি নিতে বারণ করে। কাল রাত্রে কেন তুই বাঁশবনে লুকিয়েছিলি ?'

'কি করব আমার হাত ফাঁকা। আর লোকটা পর পর দুটো গুলি চালালো।'

'ইয়েস, সেটাই কথা। তোর সাহসের অভাব এটা কেউ নিশ্চয় বলবে না। এবং গুলি চালাবার পরও তুই লোকটার পিছু নিয়েছিলি। তবু তুই শেষ পর্যন্ত লোকটাকে দেখতে না পেয়ে বাঁশবনে লুকিয়েছিলি। কেন বলত ?'

'আত্মরক্ষা করতে সবাই চায়। সেই কারণেই।'

'ভেতরের সেই ভীতু মনটাই অতিবড় সাহসীকেও বিপদের ঝুঁকি নিতে বারণ করে। তোরও তাই হয়েছিল। তাই তুই আর এগিয়ে যাসনি। তোদের মনে ঠাকুমা দিদিমারা অনেক ছোটবেলাতেই ভূতের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বড় হয়ে, যতই ভূত অবিশ্বাস করিস না কেন, সুযোগ পেলেই সেই ভুতুড়ে ভয়টা মাথা চাড়া দেয়। তখন যা না দেখিস তাও মনে হয় দেখেছিস। এখানে আসার আগে তোরা ভেবে এসেছিস ভূত দেখতে যাচ্ছি। আধো আলো আর

অন্ধকারে হাওয়ায় নারকেল পাতার দোলানি দেখে তোদের মনে হতে পারত ভূতে তার লম্বা ঠ্যাং দোলাচ্ছে। নাঃ তোরা সেদিন ভুলই দেখেছিলি।'

এবার আমি বললাম, 'বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু লোকটার সঙ্গে সুন্দরী আর তার মায়ের কি সম্পর্ক ?'

'বুঝলি না গাধা। লোকটা সুন্দরীর বাবা। হরিমাধব মারিক। সরলা ওর বৌ।'

'সেকি ? হরিমাধব থাকে একজায়গায়, সরলা আর একজায়গায়—কেন ?'

'কারণ অতি সামান্য। স্বামী-স্ত্রীর সেণ্টিমেন্টাল ঝগড়া।'

'কি রকম ?'

'হরিমাধবের পা কাটা যাবার পর দীর্ঘদিন ওকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। একটা কারখানার ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার হিসেবে ও কাজ করত—'

'নীলকাকু, ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার কি ?'

'যে কোন কলকারখানায় কিছু স্টাফ থাকে পার্মানেণ্ট। কিছু টেম্পোরারি যারা পরে পার্মানেণ্ট হবে। আর কিছু ক্যাজুয়াল। অর্থাৎ এরা কাজ জানা লোক। কিন্তু কোম্পানী এদের কাজ দিতে পারছে না। দীর্ঘদিন কোন পার্মানেণ্ট স্টাফ ছুটিতে বা অসুস্থ হয়ে আছে। অথবা হঠাৎ কোম্পানীর কাজের চাপ বেড়ে গেল। তখন বাইরের ঐ কাজ-জানা লোকদের কিছুদিনের জন্য রোজ হিসেবে মাইনে দিয়ে রাখা হয়। এদেরকেই কোম্পানীর ভাষায় ক্যাজুয়াল স্টাফ বলে। বুঝলি ?'

'হ্যাঁ, তারপর হরিমাধবের কি হল বল।'

'পা কাটা যাবার পর কোম্পানী কিছু কমপেনসেট করেছিল। তা দিয়ে আর কদিন চলে ? তারপর ঘা শুকোবার পর দেখা গেল ও ওর বাঁ পায়ের জোর হারিয়ে ফেলেছে। এদিকে জমানো টাকাও শেষ হয়ে গেল, আর পা খোঁড়া হবার জন্য কাজটাও গেল। বাধ্য হয়ে অনাদিবাবুর বাড়িতে সরলাকে ঝিয়ের কাজ নিতে হল। আর সেটাই হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার প্রধান কারণ। হরিমাধবের ইচ্ছে নয় সরলা পরের বাড়িতে ঝিগিরি করে। আর সরলা লোকের কাছে হাত পাতার থেকে ঝিগিরি করাই সম্মানজনক মনে করে। এই নিয়ে ঝগড়া। মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তারপর একদিন সকালে দেখা গেল লজ্জায় হরিমাধব কোথায় যেন চলে গেছে। আগে সরলা দিনের বেলা কাজ করে সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরে যেত। সুন্দরী সারাদিন অসুস্থ বাবাকে দেখত। হরিমাধব চলে যাবার পর বাধ্য হয়েই ঘর ছেড়ে দিয়ে সরলা আর সুন্দরী অনাদিবাবুর বাড়িতে রাতদিনের কাজের লোক হয়ে গেল।'

'বাবা, এত', খোসগল্প বানিয়ে ফেলছিস ?'

নীল হাসল, 'জীবন থেকেই ত' গল্প তৈরী হয় রে। তারপর শোন, আর একটু আছে, নানান জায়গা ঘুরে টুরে মাস খানেক আগে হরিমাধব মৃগনাভিতে ফিরে এসেছিল। কিন্তু বৌ মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারে নি—। হপ্তা দুয়েক আগে হঠাৎ একদিন শ্মশানের ঐ বটগাছটার নীচে সুন্দরী ওর বাবাকে বসে থাকতে দেখে। মেয়েটা বাবাকে প্রচণ্ড ভালবাসত। বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মায়ের ভয়ে সে তা পারে নি।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? মায়ের ভয়ে কেন? মায়ের ত' আনন্দ হবারই কথা।'

'কিন্তু এক্ষেত্রে হয় নি। সরলার অভিমান বড় বেশী। যে স্বামী তার স্ত্রীকে একলা ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারে সে স্বামী সব পারে। তার মুখ-দর্শন করাই উচিত নয় এই রকম একটা ধারণা ওর জন্মে গিয়েছিল। স্বামীকে ও খুবই ভালবাসে। ভালবাসার মানুষের কাছে আঘাত পেলে মেয়েরা প্রচণ্ড অভিমানী হয়ে ওঠে। সরলাও তাই হয়েছিল। সুন্দরী তার মাকে চিনত। তাই সে ভেবেছিল সইয়ে সইয়ে তার বাবার ফিরে আসার কথাটা জানাবে। বেচারী সে সুযোগটাও পেলো না?'

'কিন্তু অত রাত্রে সুন্দরী কোথায় যেত?'

'অনাদিবাবুর ভাঁড়ার থেকে কিছু খাবার ও ওর অভুক্ত খোঁড়া বাবার জন্যে সরিয়ে রাখত। তারপর সবাই ঘুমোলে ও চুপিচুপি জঙ্গল পেরিয়ে শ্মশানে বসে থাকা বাবাকে সেগুলো দিয়ে আসত।'

নীলের বলা বোধ হয় শেষ হয়েছিল। ও চুপচাপ হাঁটছিল। হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই এত সব জানলি কোথা থেকে?'

'দিন তিনেক আগে তোরা ঘুমিয়ে পড়ার পর দেখলাম বনের মধ্যে লণ্ঠন হেঁটে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে জানলার পাল্লা তুলে বেরিয়ে পড়লাম তোদের কাউকে না জানিয়ে। কি জানিস্, অনেক আগেই আমার মন বলেছিল, সুন্দরীর এত সাহস চিন্তার ব্যাপার। ওর কাছ থেকে সব কিছু শোনার পর বলেছিলাম এভাবে রোজ রাতে একলা যাওয়া খুব রিস্কি। তুমি তোমার মাকে তোমার বাবার ফিরে আসার কথা জানিয়ে দাও। বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। ও বলেছিল জানাবে। জানিয়েও ছিল নিশ্চয়। নইলে সরলা আর হরিমাধবের দেখা হয় কি করে? তবু আমার আফসোস কি জানিস, মেয়েটার বিপদের আশঙ্কা করেও ওকে বাঁচাতে পারলাম না। মেয়েটা নিজের জীবন দিয়েও ওর বাবামায়ের মিল করিয়ে দিয়ে গেল। এটাই ট্রাজেডি।

মিনিট পাঁচেক তিনজনে কেউ আমরা কোন কথা না বলে হাঁটলাম।

তিনজনেই হয়ত সুন্দরীর কথা চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ তাতন জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু সুন্দরীর অপরাধটা কি? সে খুন হল কেন?'

'আমার হিসেবমত গতকাল অন্য লোকের খুন হবার কথা। তাই তাকে বাঁচাবার জন্যেই জানলার পাল্লা তুলে তোদের কাউকে কিছু না বলে চলে গিয়েছিলাম। আমার হিসেবে গণ্ডগোল হত না। কিন্তু সুন্দরী হঠাৎ ঐ সময়ে ফিরে নিজের মৃত্যুটা ডেকে নিয়ে এল। আমার যতদূর ধারণা সুন্দরী খুনীকে দেখে ফেলেছিল বা চিনে ফেলেছিল। তাই চিরদিনের মত তার মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

'অন্য লোকের খুন হবার কথা কি বলছিলি?'

'হ্যাঁ। তাকে মারার জন্যেই ত' বাগানে গতকাল সাজসাজ রব।'

'কে সে?'

'পরে বলব। এখন থাক।'

'কিন্তু, আমাদের জানলায় ছায়ামূর্তি কেন?'

'নীল ব্যানার্জীকে খতম করার জন্যে। কিন্তু ও বুঝতে পারে নি একফোঁটা ছেলে তাতনের একটা হাইজাম্পে ওর চোয়াল ফেটে যাবে। লোকটা একদম আনাড়ি।'

বাড়ি এসে গিয়েছিল। আর কোন কথা হল না। কেবল নীল তাতনকে একটা হেঁয়ালি মার্কা কথা বলল, 'আলোর রহস্যটা তুই ক্লীয়ার কর তাতন। আমি সুন্দরী হত্যার জটটা খুলি। তোতে আমাতে এক জায়গায় গিয়ে মীট করব।'

'কিন্তু, আমি কি পারব নীলকাকু?'

'পারবি। যে পয়েণ্টা নিয়ে ভাবছিস সব রহস্য ঐখানেই।'

দেখতে দেখতে সাতটা দিন কেটে গেল। সুন্দরী হত্যার জট যেমনকার তেমনই রয়ে গেছে। নীলের মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ও এখনও কিছুই এগোতে পারে নি। ওর কপালের ভাঁজগুলো আরো গভীর হতে গভীরতর হয়ে চলেছে। আগে মাঝে মাঝে যাও বা দু-একটা কথা বলত এখন তাও বন্ধ।

এদিকে সুন্দরী হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সারা এলাকায় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল

সুন্দরীকে ভূতে গলা টিপে মেরেছে। রাত দুপুরে। বটগাছের নীচে। দু একজন অতি উৎসাহী সমর্থক এও নাকি বলেছে তারা স্বচক্ষে সুন্দরীর গলায় ভূতের লিকলিকে আঙুল ঢুকে যেতে দেখেছে। অবশ্য দারোগা সুকান্তবাবু যখন তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তারা আবার সেই খুনী ভূতকে দেখলে চিনতে পারবে কিনা—তখনই তাদের সব উৎসাহ নিভে গিয়েছিল। আর তাদের টিকিরও দেখা পাওয়া যায় নি। হঠাৎ রাস্তায় সুকান্তবাবুর মুখোমুখি পড়ে গেলে আকাশের তারা গুণতে গুণতে তারা ছুট লাগাতো।

এখন 'মল্লিকভবন' একেবারে খাঁ-খাঁ করে। আগে যাও বা সকালের দিকে পাড়ার কিছু লোকজন আসতেন এখন তাঁরা সবাই ডুব দিয়েছেন। যারা ভূতে বিশ্বাস করেন বা ভয় করেন তাঁরা সেই কারণেই আসেন না। আর অধিকাংশই অনাবশ্যক খুনের মামলায় জড়াবার প্রয়োজন নেই ভেবেই আসেন না।

বাড়িতে থাকার মধ্যে অনাদিবাবু আর শম্ভু। দুজনেই কেমন যেন চুপচাপ। প্রথম যেদিন অনাদিবাবু আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন সেদিনও তার মধ্যে কিছুটা চ্যালেঞ্জিং মনোভাব ছিল। সুন্দরী খুন হবার পর তিনিও কেমন যেন মিইয়ে গেছেন। এর মধ্যে একদিন গেস্ট হাউসে এসে বললেন, 'ব্যানার্জী সাহেব, কি বুঝছেন?'

নীল যেন কিছুই বুঝতে পারে নি এইভাবে বলেছিল, 'কি ব্যাপারে বলুন ত?'

'এই সুন্দরী হত্যার ব্যাপারটা—'

'কেন, মিঃ সুকান্ত দাস ত তদন্তের ভার নিয়েছেন।'

শুনে উনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'নাঃ, শেষ পর্যন্ত আমি হেরেই গেলুম। বাড়িটা আমায় বিক্রি করেই দিতে হবে। কিন্তু চট্ করে ত' আর খদ্দের পাওয়া যাবে না।'

'বাড়িটা তাহলে বিক্রি করবেনই মনস্থ করলেন?'

'না করে আর উপায় কি? একে ত' আগে থেকেই বাড়িটার বদনাম ছিল ভূতুড়ে বাড়ি বলে। যাও বা সেসব কাটানো গেল, দু একজন করে পাড়াপড়শী এসে আমার বৈঠকখানায় ভিড় জমাতে শুরু করলেন, ব্যাস, এখন যা কাণ্ড ঘটল আর কেউ এ বাড়ির ছায়া মাড়াবে না। অন্তত দশ বছরের মধ্যে। এই বয়েসে নির্বান্ধব পুরীতে একা একা আর কাঁহাতক থাকা যায়। এসব শুনে আমার স্ত্রীও আর আসবেন না—'

নীল ঠোঁটের কোণে একটু হাসি এনে বলল, 'এক কাজ করুন অনাদিবাবু, বাড়িটা আমাকে বিক্রি করে দিন। নিশ্চয়ই একটু সস্তায় পাওয়া যাবে?'

'ঠাট্টা করছেন ব্যানার্জী সাহেব ? আপনি বুঝতে পারছেন না এ আমার কত বড় লজ্জা আর পরাজয়—'

'পোড় খাওয়া লোক আপনি। আপনার মুখে কি এসব মানায় ? দাসবাবু কি বলছেন ?'

'আপনি কি মনে করেন দাসবাবু এ খুনের কিনারা করতে পারবেন ?'

'না পারার কি আছে, মানুষই অপরাধ করে আবার মানুষই সেই অপরাধের কিনারা করে।'

'দাসবাবুর কথা থাক। আপনি কি আমায় আশ্বাস দিতে পারেন ?'

'আমাকে কিন্তু আপনি ডেকেছিলেন অন্য কারণে। যদি বলি আমি আজই সে রহস্যের মীমাংসা করে দিয়ে চলে যেতে পারি।'

'অ্যাঁ, আপনি ভূতের ব্যাপারটা—'

'হ্যাঁ অনাদিবাবু, এটা জেনে রাখুন, কোনদিনও, কস্মিনকালেও আপনার বাড়িতে ভূত ছিল না আজও নেই। এ একটা ষড়যন্ত্র—'

'কিসের ষড়যন্ত্র ?'

'সব এখনই শুনে নেবেন না আমাকে আর কিছুদিন থাকতে বলবেন ?'

বুঝলাম সুন্দরী জট না ছাড়িয়ে নীল এখান থেকে নড়তে রাজী না। অথচ নিজে থেকে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হতেও ওর বাধছে। অবশ্য সে প্রশ্নটা এখন ঠিক উঠে না। কারণ দারোগা সুকান্ত দাস ত' একরকম নীলকে দায়িত্ব ছেড়েই দিয়েছেন। তবু এখানে যাঁর কাছে এসে ও উঠেছে আমন্ত্রণটা তাঁর কাছ থেকেই ও আশা করছে। নীলের কথা শুনে অনাদিবাবু ত' লাফিয়ে উঠল, 'ব্যানার্জী সাহেব, আপনি এখানে থাকলে নিশ্চিত টমি আর সুন্দরীর খুনী ধরা পড়বে। যে লোক এতদিনের একটা ভুতুড়ে রহস্য মাত্র এই কদিনে সমাধান করতে পারে সে যে সুন্দরীর খুনীকে ধরতে পারবে এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনি কথা দিলে আমি এ বাড়ি বিক্রির কথা ভুলেও ভাবব না।'

'কয়েকটা প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত আপনার খুনীকে আমি তুলে ধরতে পারছি না। আর কয়েকটা দিন আমার সময় চাই।'

'অ্যাঁ, বলেন কি মশাই ? আপনি খুনী কে তা বুঝতে পেরেছেন ?'

'খানিকটা আঁচ করতে পেরেছি। কিন্তু তার মোটিভটা না খুঁজে পেলে একটুও এগুতে পারছি না। তবে অপরাধী একটা বিরাট ভুল করে ফেলল—'

এবার তাতন প্রশ্ন করল, 'কি ভুল নীলকাকু ?'

'একটা পশু আর একটা মানুষকে খুন করে। খুন করেই ভূতের রহস্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। নইলে এখনও আমাকে অগাধ জলে

হাবুডুবু খেতে হত। অপরাধ যে করে সেও ত' মানুষ। ভুল হওয়া তার স্বাভাবিক। আর তাই বোধহয় তার ভুল করে ফেলে যাওয়া সূত্র ধরে পুলিস তাকে খুঁজে বার করে। ক্রাইম ডাজ্ নেভার পে। এটাই হয়। ঠিক আছে অনাদিবাবু, আপনি যান, আমি চেষ্টা করছি এবাড়ি যাতে আপনাকে ছাড়তে না হয়।'

'আঃ বাচালেন', বলে ভদ্রলোক সেদিন চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু নীলের কোঁচকানো ভুরু সোজা হয়নি একটুও। অনাদিবাবুকে ও আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু অসংখ্য চিন্তায় নিজে আরো বেশী করে নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে।

শম্ভুর কাছ থেকে কোন সূত্র পাওয়া যায় নি। লোকটা একটু গোঁয়ার আর নিরেট। কাটাকাটা উত্তর দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে খুনের রাতে সে একবারও ঘরের বাইরে যায় নি। কারণ একবার শুলে কোথা দিয়ে রাত ভোর হয়ে যায় সে নিজেও জানে না।

সুন্দরীর মা দিনকতক কাটা ছাগলের মত ছটফট করেছিল। পুলিসের হুকুম নেই তাই সে কোথাও যেতে পারে না। এখন বোবার মত চুপ চাপ ঘরে বসে থাকে। একদিন বিকেলের দিকে নীলের কাছে এসে বলেছিল, 'আমাকে ছেড়ে দেও বাবু। কেন আটকে রেখেছ? তোমরা কি মনে কর আমি আমার সুন্দরীকে খুন করেছি?'

সান্ত্বনা দিয়ে নীল বলেছিল, 'তুমি কি চাওনা তোমার মেয়ের খুনী ধরা পড়ুক?'

'তাতে আমার কিছু লাভ আছে বাবু? সুন্দরী কি আর আমার কাছে ফিরে আসবে? বিশ্বাস কর বাবু, ও ঘরটায় আর আমি থাকতে পারছি না।'

এ কথায় নীল কোন জবাব দিতে পারে নি। একমাত্র 'সময়' ছাড়া সুন্দরীর মায়ের সমস্যা কেউ সমাধান করতে পারে না।

আর একটা রবিবার ফিরে এল। নীল বলল, 'আজই তিনটে দশের গাড়িতে আমায় কলকাতায় যেতে হবে। তার আগে চল একটু ঘুরে আসি। আজ রবিবার। মনে হয় সবাইকেই পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু তুই কলকাতা গেলে আমরা?'

'তোরা যেমন আছিস তেমনিই থাকবি। আর কোন খুনখারাপী হবে বলে মনে হয় না। তবে অনাদিবাবুকে একটু নজরে রাখবি। দুজনেই।'

তাতন আর আমি দুজনেই চমকে উঠলাম, বললাম, 'সে কিরে?' শেষ-কালে অনাদিবাবুকে—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলল, 'যা করতে বলছি তাই কর। প্রশ্ন করবি না এখন।'

অগত্যা সুবোধ বালকের মত ওর পিছু পিছু আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের আশপাশের অনেক কৌতূহলী চোখ আড়াল আবডাল থেকে নীলকে দেখছিল। তার কারণ দারোগা সুকান্ত দাস। তাঁর মহিমায় এবং ঘন ঘন নীলের সঙ্গে দেখা করায় নীলের সত্য পরিচয় প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল।

ঠিকানাগুলো আগেই সংগ্রহ করা ছিল। অবশ্য দেশ পাড়াগাঁয়ে নাম বললেই বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। প্রথমেই নীল গেল তারিণী সেনের হোমিওপ্যাথির ডাক্তারখানায়। ডাক্তারখানা মানে ওনার বাড়ির বৈঠকখানা। মেটে আটচালা ঘর। রুগীটুগী কেউ ছিল না। চেয়ারের ওপর তিনমাথা এক করে উনি ঢুলছিলেন। আমাদের পায়ের শব্দে চট্‌কা ভেঙে গেল। প্রথমটা চিনতে পারেন নি। ঘড় ঘড়ে গলায় হাঁপানির শ্বাসটেনে বললেন, কি হয়েছে? জ্বর নাকি? নতুন ঠাণ্ডা পড়ছে। জ্বর ত হবেই।'

'আজ্ঞে না আমি।'

চোখ কচলে ভালো করে দেখে বললেন, 'ফের আপনি এয়েছেন? সেদিনই ত' আপনাকে বললাম ওসব খুনটুনের আমি কিছু জানি না। আর এই বুড়ো বয়েসে কি আমি খুন করে ফাঁসির দড়িতে লটকাবো? আমার কি পরকালের ভয় নেই?'

একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে ওনার হাঁপের টানটা বেড়ে গেল। একটু সামলাতে নীল বলল, 'আমি সে জন্যে আসিনি কিন্তু।'

'তবে কি এই বাসি বুড়োর তোবড়ানো গালের মহিমা দেখতে এয়েছেন?'

তদন্তের কাজে নীল লজ্জা ঘৃণা ভয় আর মান অভিমান ভুলে যায়।

ও বলল 'আজ্ঞে তাও না!'

'তবে পুলিসের লোকের এখেনে কি ঠ্যাকা মশাই?'

'না মানে সামান্য একটু সর্দি জ্বরের মত হয়েছিল। তাই।'

'অ। তাই বলুন। বয়স কত? প্রেসার কি? অগ্নিমান্দ্য আছে? তেষ্টা লাগে?'

নীল এককথায় উত্তর করল 'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'বসুন। আমার ফীজ কিন্তু দুটাকা। নাড়ী দেখি।'

হাতটা বাড়িয়ে দিল নীল। ভদ্রলোক খানিকক্ষণ নাড়ী টিপে কি বুঝলেন কে জানে। পাশে রাখা মান্ধাতা আমলের চামড়ার হোমিওপ্যাথির বাক্স খুলে ওষুধ বার ক'রে সুগার অব মিল্ক পাউডারের সঙ্গে মেশাতে শুরু করলেন।

এই ফাঁকে নীল বলল, 'আচ্ছা তারিণীবাবু, আপনি ত' প্রবীণ লোক।'

'দেখলে কেউ আমায় 'মুখে ভাত' হয়নি এমন খোকা বলবে নাকি?'

'না তা বলবে না। আচ্ছা আপনার কি এখানেই জন্ম?'

ওষুধ তৈরী করতে করতে উনি বললেন, 'আমার বাবা ত' তাই বলে গেছেন।'

'তাহলে নিশ্চয় আপনি এখানকার সবাইকে চেনেন?'

'ন্যাড়া কিন্তু দুবার বেলতলায় যাবে না। এই নিন ওষুধ। দিনে তিনবার। ওষুধ খাবার আগে পরে আধঘণ্টা কিছু খাওয়া চলবে না। দিন দুটাকা ফিজ।'

নীল ফিক্ করে হেসে ফেলল। পার্স থেকে দুটো টাকা ওঁর সামনে রেখে উঠতে উঠতে বলল, 'আপনাকে সন্দেহ আমি করিনি। তবে কিছু তথ্য জানলে মার্ডার কেসটা সল্‌ভ্ করা যেত।'

'তারপর আমি মার্ডার হলে আমার বিধবা নাতনীটাকে কে দেখবে? আপনি?'

'তাতো বটেই' 'তাতো বটেই' বলে নীল চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলল, 'আজ চলি কেমন?'

'আসুন। আর হ্যাঁ, শুনুন, হোমিওপ্যাথ ওষুধ খাবার নিয়ম আপনার মানার দরকার নেই।'

'সেকি কেন?'

'আপনার কিস্যু হয় নি। আমায় ফল্‌স্ দিয়েছিলেন, তাই আমিও আপনাকে ফল্‌স্ ঝেরেছি। ওটা স্রেফ—'

'তাহলে ফীজটা নিলেন কেন?'

'গোয়েন্দাগিরির খেসারত', বলেই আবার তিন মাথা এক করে ফেললেন।'

বাইরে বেরিয়ে এসেই তাতন বলল, 'বাপ্‌রে, কি বিচ্চু বুড়ো। শেষকালে নীলকাকু তোমাকেই ফল্‌স্ দিয়ে দিল।'

'কিন্তু একটা জিনিস পরিস্কার করে দিল, ও মুখ খুললে ওকে মরতে হবে। তার মানে হয় ও খুনীকে চেনে নয়ত এ ব্যাপারে অনেক কিছুই জানে। ঠিক আছে, আমিও নীল ব্যানার্জী। একদিন না একদিন সব কিছুই জানতে পারব।'

সুকোমল ভট্টাচার্য লোকটা সত্যিই ভাল। ভদ্রলোককে স্টেশনের কাছাকাছি ভট্টাচার্য মেডিক্যাল হলেই পাওয়া গেল। আমরা যেতেই নমস্কার টমস্কার করে তিনখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। আমাদের আপত্তি সত্বেও ছোকরা শপ্ এ্যাসিস্ট্যানকে তিনকাপ চা আর কেক আনতে পাঠালেন। কিন্তু আদর আপ্যায়নই হল। কাজের কাজ কিছুই না। ভদ্রলোক রিটায়ার করবার পর এখানে জমিটমি কিনে বাড়ি করেছেন। একটা ডাক্তারখানা সাজিয়ে বসেছেন। নীলের প্রশ্নের কোনটারই কোন সঠিক জবাব পাওয়া গেলনা। অধিকাংশই 'না ঠিক বলতে পারব না' দিয়েই শেষ করলেন।

এরপর আমরা গেলাম রামহরি দত্তের বাড়ি। ভদ্রলোক কোথাও বোধহয় বের হচ্ছিলেন। রাস্তাতেই ওনার সঙ্গে দেখা। নীলই প্রশ্ন করল, 'কোথাও যাচ্ছিলেন নাকি ?'

'কে ? ও, গোয়েন্দা সাহেব। হ্যাঁ, একটু হাটে যাচ্ছিলাম মুরগীর বাচ্চার খোঁজে।'

'পোলট্রি করবেন না খাবেন ?'

'এই বয়েসে আবার পোলট্রি। যে কদিন বেঁচে আছি একটু ভালোমন্দো খেয়ে নেওয়া আর কি।'

'এমন আর কি বয়েস হল যে এরি মধ্যে মরার কথা ভাবছেন ?'

'তা খুব একটা কমও হল না। মেঘে মেঘে বেলা। প্রায় পঁয়ষট্টি ত' হবেই। তা এদিকে কোথায় ?'

'স্টেশনে এসেছিলাম। কলকাতা যাবার গাড়িগুলোর টাইম জানতে।'

'অনেক পাবেন। পনের বিশ মিনিট অন্তরই আছে। তা আজকেই যাচ্ছেন নাকি ?'

'সেই রকমই ইচ্ছে আছে।'

'হ্যাঁ, কলকাতার ছেলে, কত দিনইবা ঐ ভুতুড়ে বাড়িতে পড়ে থাকতে ভাল লাগবে। তা এদিকে কিছু হল ?'

'কিসের ?'

'ঐ যে ঐ ঝি মেয়েটার খুনের ব্যাপারে।'

'নাঃ। তাছাড়া কেসটা ত' আর আমার হাতে নেই। ওটা সুকান্ত দাসমশাই দেখাশুনো করছেন।'

'তাই নাকি ? বেশ বেশ। কটার গাড়িতে যাচ্ছেন ?'

'তিনটে দশ। আচ্ছা আপনি ত' অনেক দিন এখানে আছেন। তার ওপর প্রবীণ লোক, একটা পরামর্শ দিতে পারেন ?'

'কি বলুন ত' ?'

'অনাদিবাবু বাড়িটা বিক্রি করতে চাইছেন। মাত্র বিশ হাজারে। কেনা কি উচিত হবে ?'

কথার তোড়ে রামহরিবাবু কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেলেন, একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'অনাদি বাড়িটা বিক্রি করে দেবে ? আমাকে ত' একবারও জানালো না ?'

'না, কথায় কথায় বলছিলেন আর কি ? এখনো কিছু ঠিক করেন নি। তা আপনি কি বলেন, কেনা উচিত হবে ?'

'দাঁওটা ভাল। তবে সুরাট করবে কি ?'

'কেন ?'

'একে ভূতের বাড়ি। তার ওপর কয়েকদিন আগে খুন হয়ে গেছে। আমার মতে ভেবে-চিন্তে কেনাই ভাল।'

'হুঁ। আমিও ত' তাই ভাবছি। দেখি। তবে এত সস্তায় আর ত' কোথাও পাওয়া যাবে না।'

'নাঃ আমি যাই। বেশী দেরি করলে আর মুরগী পাওয়া যাবে না।' বলেই তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন।'

বোধহয় বাড়িটা কেনার তালে উনিও আছেন। নীল উড়ে এসে দাঁও মারবে এটা ওঁর মনঃপূত না।

বিমল আর তুহিনকে পাওয়া গেল না। কলকাতায় ইণ্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট চলছে। ওরা এখন ওখানে।

বিজন দাস মানে জাপানীদের মত দেখতে সেই ভদ্রলোকের বাড়িটা খুঁজে পেতে একটু দেরি হল। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট্ট একতলা বাড়িতে উনি থাকেন। সাধু বলে একটা চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। ভদ্রলোক বিয়ে-থাও করেন নি। একাই থাকেন।

বাড়িটা খুঁজে পাবার পর নীল বলল, আশ্চর্য, সামান্য ভূতের গল্প শুনে যে লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে সে লোক একা গ্রামের একেবারে শেষ দিকে কি করে থাকে ?'

আমরা কেউ ওর প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই দরজাটা খুলে গেল। সামান্য ফাঁকে এক জাপানী ডলের সোনালী চশমা পরা মুখ বেরিয়ে এল। কুতকুতে চোখে ভয়ের ছায়া। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরই কান এঁটো করা হাসি, 'হেঁ হেঁ, আপনারা ? আসুন আসুন। আমার কি সৌভাগ্য।'

নীলের এতক্ষণের চরিত্রটা এবার কেমন পাল্টে গেল। উল্টোপাল্টা প্রশ্ন আরম্ভ করল ভদ্রলোককে, 'একটু বসা যাবে ?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। নামেই বৈঠকখানা। আসবাব-পত্রের কোন বালাই নেই। খান দুয়েক চেয়ার। একটা তক্তা। সেখানে বিছানা পাতা। বালিশ দুমড়ানো। চাদর দলাপাকিয়ে রয়েছে। একটা ইংরেজী মাসের ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। তাও কয়েক মাস পাতা ছেঁড়া হয় নি। ঘরের সব কিছুর মধ্যেই একটা বিশৃংখলতা। এখানে চায়ের ভাঁড়। ওখানে পোড়া সিগারেটের টুকরো। আলনায় কয়েকটা পাঞ্জাবী আর শার্ট ঝুলছে। সেগুলোও ময়লা ময়লা। আসলে এটা বৈঠকখানা না শোবার ঘর কিছুই বোঝা গেল না। চেয়ার দুখানা আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বসতে বলে বেরিয়ে গেলেন। পাশের ঘর

থেকে একটা ছোট টুল এনে দিলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ী কোন ভুল নেই। হাতজোড় করে বললেন, 'সকাল বেলা এসেছেন, নিশ্চয়ই একটু চা চলবে ?'

'চা একটু আগেই খেয়ে এসেছি। দরকার হবে না।'

'তাও কি কখনও হয় ? এত বড় একজন নাম করা লোক, আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলেন, শুধু মুখে কখনও যেতে দিতে পারি ? আপনারা একটু বসুন।'

বলেই উনি বেরিয়ে গেলেন। বিজন বেরিয়ে যাবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নীল তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর ঘরের একমাত্র দেওয়াল আলমারি যেটায় একটা গদরেজের তালা ঝুলছিল সেদিকে যেতে যেতে বলল, 'তাতন, দরজাটা একটু খেয়াল রাখিস। লোকটা এলেই বলবি।'

আলমারিটার কাছে গিয়ে তালাটা একবার টেনে দেখল। আটকানোই আছে। পাল্লাগুলোয় কাঁচ লাগানো। উঁকি দিয়ে ভেতরটা বেশ কয়েক মিনিট দেখল। তারপর হঠাৎই নীচু হয়ে কি একটা জিনিস তুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিল। এমন সময় তাতনের 'হুস্' আওয়াজ শুনে ও ভালোমানুষের মত নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়ল—।

বিজনবাবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'কি বোকা ছেলে গো! দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেন ? বসো না।'

বিনা বাক্যব্যয়ে তাতন গিয়ে পরিত্যক্ত টুলের ওপর বসে পড়ল। বিজনবাবু তক্তার ওপর বসতে বসতে বললেন, 'একটু দেরি হল। চায়ের জলটা চাপিয়ে এলাম। সাধুকে পাঠিয়েছি দোকানে, বাধ্য হয়ে আমাকেই রান্নাঘরে যেতে হয়—।'

নীল কিন্তু এই সব খাজুড়ে আলাপে উৎসাহী ছিল না। ও একেবারে কাঠ কাঠ প্রশ্নে রীতিমত জেরা শুরু করে দিল, 'বিজনবাবু, বুজতেই পারছেন, আমি কেন এসেছি ?'

'—হে হে এটুকু আর বুঝব না। সুন্দরী হত্যার তদন্তের ভার ত' এখন আপনার উপরই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আর সেই কারণে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'কিন্তু আমি আর কতটুকু জানি ও বাড়ি সম্বন্ধে। কালেভদ্রে এক-আধবার অনাদিবাবুর বাড়িতে যাই—এই পর্যন্ত।'

এই বলে পকেট থেকে সিগারেট বার করলেন। চার্মিনার। 'চলবে নাকি ?'

'না, আচ্ছা, রামহরি দত্ত লোকটা কেমন বলতে পারেন ?'

'ভালোই ত। তবে মাঝে মাঝে এমন বিশ্রী ভুতের গল্প বলেন!'

'আপনার কি ভূতের ভয় আছে ?'

'খুব। রাত্রে বাথরুম গেলে সাধুকে বাইরে দাঁড় করিয়ে যাই।'

'তাহলে এইরকম একটা একপেশে জায়গায় থাকতে ভয় করে না ?'

'না। সাধু ত' আছে।'

'বাড়িটা কি আপনার নিজের ?'

'কোনটা ? এটা ? পাগল নাকি ? আমার কলকাতার এক বন্ধুর বাড়ি। সে ত' কোনদিনই আসে না। বেহাত হয়ে যাবার ভয়ে আমায় থাকতে দিয়েছে।'

'কতদিন আছেন ?'

'বছর দশবারো ত' হবেই।'

'আশ্চর্য। বাড়ি তামাদি হয়ে যাবার দাখিল।'

'নাঃ, আমি বেইমান নই। সে যখনই চাইবে তখনই ছেড়ে দোব।'

'আপনি কি করেন ?'

'টুকটাক এটা সেটা। তবে মেইনলি অর্ডার সাপ্লাই।'

'পরশু কলকাতা গিয়েছিলেন কেন ?'

ভদ্রলোকের মুখটা নিমেষে কেমন পেল্‌ হয়ে গেল। তারপর একটু ঢোক গিলে বললেন, 'আপনি কি করে জানলেন ?'

একটু আগে কুড়িয়ে পাওয়া টিকিটটা পকেট থেকে বার করে বলল, 'এই অনুমান আর কি ? ঘর থেকে কুড়িয়ে পেলাম কিনা ?'

একটু কাষ্ঠ হেসে বিজনবাবু বললেন, 'মাঝে মাঝে কলকাতা কেন অনেক জায়গাতেই যেতে হয়। অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ ত' ?'

'সাপ্লাইটা কি লোহালক্কড়ের ?'

'সাপ্লাইটা কি লোহালক্কড়ের ?'

'এটা জানলেন কি করে ?'

'এটাও অনুমান। আচ্ছা বিজনবাবু আপনার এ বাড়িতে আপনি আর আপনার চাকর, কি নাম বললেন যেন, হ্যাঁ সাধু এই দুজন ছাড়া আর কেউ থাকেন না ?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনার স্ত্রী ?'

'বিয়েই করিনি।'

'এ ফতুয়াটা কার ?' বলেই ও তক্তার তোষকের নীচ থেকে বেরিয়ে থাকা একটা হাতা ধ'রে মারল একটান। বেরিয়ে এল একটা কাদামাখা ফতুয়া।

'একি ? এটা এখানে কেন, এখানে কেন ?

'আপনার নাকি ?'

'না না, ওত' সাধুর। ব্যাটা পাজির পা ছাড়া। ময়লা ফতুয়া নিয়ে বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখেছে। হতচ্ছাড়াকে পিটোলেও রাগ যায় না। ঐ পাশেই ফেলে দিন, ময়লা নোংরা জামা। বসুন, আপনাদের চা হোল কিনা দেখি।

বিজনবাবু চা আনতে গেলেন। নীল ততক্ষণে ফতুয়াটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। কি যেন শুঁকলও। তারপর বেমালুম সেটা ওর কাঁধের ঝোলা ব্যাগে চালান করে দিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক পর বিজনবাবু চারটে ভাঙ্গা কাপে চা আর নোনতা বিস্কিট নিয়ে এলেন। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আর বলবেন না মশাই, কেরোসিন পাওয়া যায়ত' কয়লা পাওয়া যায় না, আবার কয়লা পাওয়া যায় ত'কাঠ পাওয়া যায় না। এ পোড়া দেশে আর থাকতেই ইচ্ছে করে না।'

'তাতো বটেই' নীল গম্ভীর সায় দিয়ে বলল, 'আচ্ছা বিজনবাবু, আপনি ইণ্ডিয়ার বাইরে অনেকদিন ছিলেন, তাই না?

'এটা জানলেন কি করে? অনুমানে?

হ্যাঁ এটাও অনুমান! আপনি যতই ভালো বাংলা বলুন না কেন আপনার কথায় বিদেশী এ্যাক্‌সেন্ট রয়ে গেছে।

আপনি ঠিকই ধরেছেন। তাহলে শুনুন মশাই। আমার জন্ম এদেশেই নয়। আমার মা দিদিমা এঁরা ছিলেন জাপানী মহিলা।'

'আই সী। তাই আপনাকে—

'ঠিকই ধরেছেন। আমার চেহারাটা জাপানীদের মত।'

'একটু খুলে বলুন।'

'আমার ঠাকুর্দা ছিলেন বাঙালী। ভাগ্যের খোঁজে গিয়েছিলেন জাপান। ভাগ্য ফিরেছিল এক জাপানী ভদ্রলোকের সহায়তায়। সেই থেকে উনি থেকে গিয়েছিলেন ওখানেই। বিয়েও করেছিলেন সেই জাপানী ভদ্রলোকের মেয়েকে। আমার বাবাও তাই। আমার মা ছিলেন জাপানী মহিলা।'

'তাহলে আপনি আবার এখানে ফিরলেন কেন?'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিজনবাবু বললেন, 'ব্যবসা করে ঠাকুর্দা বড়লোক হয়েছিলেন। কিন্তু বাবা ছিলেন একটু কবি প্রকৃতির। ব্যবসা উনি বুঝতেন না। তাই সেটা ডকে উঠল। বাবা জাপান ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে এলেন সামান্য পুঁজি নিয়ে।'

'তাই বুঝি আপনি খুব কবিতা লেখেন?

'মাথা খারাপ? ওসব একদম আসেনা। আমার দাদু ভালো ব্যবসা করতে পারতেন। বাবা ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। কিন্তু আমি না পারি ব্যবসা করতে না পারি কবিতা লিখতে?'

'পড়তে ?'

'তাও না। কবিতার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।'

'তবে যে রামহরিবাবু বললেন আপনি খুব সুকুমার রায়ের ভক্ত।'

'কে সুকুমার রায় ?'

'নাম শোনেন নি ?'

'না মশাই, বললাম না, ওসব কবিতা টবিতা আমার ধাতে একদম পোষায় না। রামহরি ইজ এ গ্রেট লায়ার। দেখলেন না সেদিন কি রকম বানিয়ে বানিয়ে ভুতের গল্প বলল।'

'তা হবে। তবে জাপানে জন্ম হলেও আপনার বাংলা প্রোনানসিয়েশন বেশ ভালো।'

'ঠাকুর্দা বা বাবা এঁরা জাপানে থাকলেও জাপানী হয়ে যাননি। বাংলার চর্চা আমাদের বাড়িতে সর্বদাই ছিল। আমার মাও বাংলা বলতে পারতেন। খুব ভালো না হলেও খারাপ না।'

নীল যে কোন্‌দিকে গাড়ি চালাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। ট্রেনের টিকিট। ফতুয়া। জাপানী বাবা মা। বাংলা কবিতা। রামহরিবাবুর নামে মিথ্যে বলা। সবটাই হচ্‌পচ্‌ ব্যাপার। অথচ ও একবারও সুন্দরী সম্বন্ধে একটাও প্রশ্ন করল না। জানতেও চাইল না সুন্দরী হত্যার রাত্রে বিজন দাস কোথায় ছিল ? এ কেমন ধারা জেরার ছিরি কে জানে ?

হঠাৎ নীল উঠে পড়ল। বলল, 'একটু বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না। হ্যাঁ আর একটা প্রশ্ন, জাপানে আপনাদের কিসের ব্যবসা ছিল ?'

'লোহালক্কড়ের। এই আপনার স্ক্রু, নাট বল্টু এই সব আর কি।'

'আচ্ছা নমস্কার' বলেই ও রাস্তায় পা বাড়ালো। আমরাও বিজনবাবুকে নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম। নীলকে এখন কোন প্রশ্ন করা বারণ। করলামও না। একটু পরে ও নিজেই বলল, 'সব ধোঁয়া। এখন ভরসা দুজন। তারক প্রামাণিক আর নীলমণি পাকড়াশি। দেখা যাক শেষ চেষ্টা করে।'

এই সময় একবার মাত্র বলতে পেরেছিলাম 'কি খুঁজছিস নীল ?'

ও বলল 'জটের সুতোর মুখটা। না পাওয়া গেলে জট ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।'

তিনজনেই আনমনে হাঁটছিলাম। হঠাৎ নীল ওর স্বভাব মত দুম করে একটা বেখাপ্পা কাজ করে বসল।

লম্বা আর ছিপছিপে সাধারণ চেহারার একজন লোক বাজার নিয়ে ফিরছিল। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। নিজের মনেই আসছিল। নীলও মাথা নীচু করে হন্‌হন্‌ করে একেবারে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা

হকচাকিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই নীল ফস্ করে ওর বাজার সমেত ডানহাতটা তুলে ধরে বলল 'আরে সতীশ যে, তুই এদিকে ?'

এক একজন পুরুষ মানুষ আছেন যাঁদের গলার আওয়াজ মেয়েদের মত। হকচাকিয়ে যাওয়া ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে লোকটা ঐ রকম গলায় বলল, 'কে, কে সতীশ ? কার কথা বলছেন আপনি ?'

'সে কিরে আমায় চিনতে পারছিস না ? মুখ দিয়ে কতরকম আওয়াজ বার করতে পারতিস। বেড়ালের ডাক, বাঘের ডাক, পেত্নীর ডাক—তোকে নিয়ে আমি সেই বিশ্বম্ভর যাত্রা পার্টির ম্যানেজারের কাছে গেলাম। এরি মধ্যে ভুলে গেলি ?'

'ধ্যাৎ' বলে লোকটা ঝট্‌কা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল 'সকাল বেলাতেই গাঁজা খেয়েছেন নাকি ? আমার নাম সাধু। বিজনবাবুর বাড়িতে কাজ করি। যত্তসব ঝামেলা।' বলেই লোকটা হন্‌হন্ করে চলে গেল।

ওর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নীল মিটিমিটি হাসল। তারপর বলল, 'তাড়াতাড়ি চ'। নীলমণিকে পাকড়াও করতে হবে।

'কিন্তু এ লোকটা কে ?'

'সাধু। একটু আলাপ করার ইচ্ছে হ'ল, তাই।'

নীলমণি পাকড়াশির দেখা যদিও পাওয়া গেল উনি আমাদের কুকুর খেদানোর মত তাড়িয়ে দিলেন, 'কি ভেবেছেন মশাই আপনারা ? আমরা চোর ছ্যাঁচোড় না খুনী বদমাইস ? 'একবার সুকান্ত দারোগা এসে ধমকাবে। একবার আপনি এসে জেরা করবেন। যান যান কাটুন মশাই। আমি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই।' বলেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তবু মানুষের চেষ্টা বিফলে যায় না। এখনও গেল না।

তারক প্রামাণিক লোকটা অত্যন্ত দাম্ভিক আর রাশভারি। এক কালের পুলিস অফিসার। জীবনে অনেক খুনী আর ডাকাত শায়েস্তা করেছেন। সেই আত্মগর্বটুকু ত' থাকবেই।

ছোটখাটো বাংলো প্যাটার্নের বাগানসমেত বাড়ি।

সামনে লোহার গেট। সমস্ত বাড়িটা লালরঙের ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। লোহার দরজাটা খোলাই ছিল। একটু ঠেলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। কাঁকড় বিছানো সরু পথ। দুধারে ফুলের বাগান। একজন বয়স্কা মহিলা ফুলের বাগানে পরিচর্যায় ব্যস্ত। আমাদের দেখেও দেখলেন না। মনে হল উনি এই ধরনের লোক সমাগমে অভ্যস্ত।

খানিকটা এগোতেই দেখলাম ঘরের সামনে লাল সিমেন্টের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছেন। পায়ের কাছে সাদা

স্পীড্ ডগ। আমাদের দেখে দুবার লাফিয়ে 'কেঁউ কেঁউ' করে উঠল। খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে উনি আমাদের দেখলেন। মুখের চুরুটটা নামিয়ে বললেন, 'আসুন।'

শিষ্টতার অভাব নেই। সামনেই বেতের সোফা। বসতে বললেন। তারপর আমরা কিছু বলার আগেই বললেন, 'হুঁ, তদন্তে এসেছেন?'

নীল বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বুঝতেই ত' পারছেন।'

'আলো দেখা যাচ্ছে? না সবটাই অন্ধকার?'

'খানিকটা। কিন্তু একটা জায়গার অন্ধকার কিছুতেই ফিকে হচ্ছে না।'

'হুঁঃ, আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন?' জেরা না সাহায্য?'

ভদ্রলোক স্পষ্টবাদী। নীলও স্পষ্ট কথাই বলল, 'সন্দেহ আমাদের সবাইকেই করতে হয়। তবে আপনাকে করছি না।'

'কেন? এক্স্ পুলিস অফিসার কি ক্রিমিন্যাল হতে পারে না?'

'পারে? কিন্তু আমি জানি আপনি এখানে পঁচিশ বছর আছেন। পলাশ-মায়ার চুঁচুড়ার ডাকসাইটে পুলিস অফিসার তারক প্রামাণিকের নাম সবাই জানে। আর আমার ধারনা যদি ঠিক হয় তাহলে আজকের এই সুন্দরী হত্যা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। এর পেছনে আছে বিরাট চক্রান্ত। সে চক্রান্তে যদি আপনার জড়ানোর ব্যাপার থাকত তাহলে গদীতে থাকাকালীনই আপনি জড়াতেন। কারণ তখন আপনার হাতে সুযোগ আর সুবিধা ছিল অনেক। তাই আপনাকে সন্দেহের বাইরে রেখেই আমি আপনার কাছে কিছু তথ্যের জন্যে এসেছি।'

তারকবাবু চুরোটটা মুখে রেখেই বাইফোকাল লেন্সের ভেতর দিয়ে নীলকে খানিকক্ষণ দেখলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, আমিও চাই এ রহস্য ক্লীয়ার হোক। আমার বয়েস থাকলে হয়ত আমিই আপনার মত লেগে যেতাম। কারণ ঐ বাড়ির কিছু রহস্য আমার জানা আছে। রিটায়ার করার পর আর শত্রু বাড়াতে চাইনি বলেই চুপ ক'রে আছি। আপনার মত ইয়াং ম্যানকে সাহায্য করতে আমার আপত্তি নেই। বলুন কি আপনার জিজ্ঞাস্য? কিন্তু এঁরা কারা?'

নীল আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল।

ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল, 'হুঁ, গোয়েন্দা গল্পের বইতে এইসব থাকে আর কি! ঠিক আছে প্রশ্ন করুন।'

'মল্লিকভবনের' অরিজিন্যাল মালিক কে?'

'বর্তমানে মল্লিকভবন অনাদিবাবুর সম্পত্তি। তবে মল্লিকদের শেষ বংশধর ছিলেন রামমাণিক্য মল্লিক। বাড়িটা উনিই বিক্রি করেন এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে।'

নীল বলল, 'জানি। কিন্তু বাড়িটা রামমাণিক্যবাবু বিক্রি করলেন কেন ?'

'বোধ হয় দেনার দায়ে। অথবা ওনার স্ত্রী হঠাৎ আত্মহত্যা করার জন্যেই।'

'আত্মহত্যা ?'

'আমি বিশ্বাস করি না। তবে লোকপ্রবাদ তাই।'

'মিসহ্যাপটা কতদিন আগে হয় ?'

'প্রায় বছর পনের।'

'কিন্তু বাড়ি বিক্রি হয়েছে বছর দশেক।'

'রামমাণিক্যবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঐ বাড়িতে নানান ধরনের ভুতুড়ে উৎপাত শুরু হয়। কেউ কিনতে চায় না। তারপর অতবড় বাড়ি। বাগান। বেশী টাকা দিয়ে কেনার লোকও ত' চাই।'

'ভূতের উৎপাত সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন ?'

'হুঁঃ অল বোগাস। আমি নিজে অনেকদিন দেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই নজর পড়ে নি।'

'আপনি নিজে কি কোন দিন কেসটা হাতে নেবার কথা চিন্তা করেছিলেন ?'

'সময় পাই নি। বাড়িটাও বিক্রি হল আর আমারও রিটায়ারমেণ্ট হয়ে গেল। তবে ও-বাড়িতে কিছু একটা রহস্য আছে। ভূতের ভয় দেখিয়ে কেউ বা কিছু লোক বাড়িটা ফাঁকা রাখতে চাইছে। এগুলো সবই আমার অনুমান। যে কাজটা আমি করিনি বা করার সুযোগ পাই নি, আপনি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। একটা পরামর্শ আমি দিচ্ছি। ও-বাড়ির সব রহস্য খুঁজে বার করুন। তাহলে মোটিভটা পেয়ে যাবেন। মোটিভ পেলে অপরাধীকেও পাবেন। আর, একটা সন্ধান দিচ্ছি যেখানে গেলে, আমার বিশ্বাস কিছু ক্লু আপনি পেয়ে যাবেন।'

সাগ্রহে নীল বলল, 'বেশ বলুন।'

'রামমাণিক্যবাবু এখনও বেঁচে আছেন। কতদিন বাঁচবেন জানি না। কারণ ওঁর বয়েস হয়েছে অনেক। উনি মারা যাবার আগেই, অবশ্য দু একদিনের মধ্যে যদি ওঁকে কেউ হত্যা না করে থাকে, চলে যান ওঁর কাছে। অনেক কিছু সূত্র পেতে পারেন।'

'উনি আছেন কোথায় ?'

'কলকাতায়।'

বলেই উনি উঠে গেলেন। তিন চার মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন। ঠিকানা এটাই। যদি না

ঠিকানা বদল হয়ে থাকে। এবার আপনারা আসুন। আমাকে চান করতে যেতে হবে। উইস্ ইউ বেস্ট অব লাক।'

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নীল আমাদের সঙ্গে কিছুটা এল। ওকে খুব চিন্তাচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়ল, হাতের রিস্টওয়াচটা একবার দেখল তারপর বলল, 'এখনো গেলে একটা তেইশের গাড়িটা ধরা যাবে। তার মানে কলকাতা পৌঁছতে সাড়ে তিনটে। ঠিক আছে বলেই ও পার্স থেকে একটুকরো সাদা কাগজে খস্ খস্ করে কি যেন লিখল, তারপর কাগজটা আর ওর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই চিঠি আর এর মধ্যে একটা ফতুয়া আছে—দুটো জিনিস দাসবাবুর কাছে আগে পৌঁছে দিবি। তারপর বাড়ি যাবি। অনাদিবাবু জিজ্ঞাসা করলে বলিস আমি দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরব।'

আমি বললাম, সে কিরে ? চান খাওয়া করবি না ?'

'একদিন দুদিন চান খাওয়া না করলে মানুষ মরে যায় না। তোরা এর মধ্যে সুকান্তকে বলবি ঠিক সময়ে ওর সঙ্গে আমি দেখা করব। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এমনিতে তোদের বাইরে বেরুবার দরকার নেই। একান্ত প্রয়োজন না হলে রাস্তায় থাকবি না। বরং লোককে যদি বোঝাতে পারিস আমরা এখানে নেই সেটাই হবে সব থেকে সুবিধের। অনাদিবাবুকে চোখে চোখে রাখবি। আর তাতন, তুই কতদূর এগিয়েছিস ?'

তাতন বলল, 'এখনি শুনবে ?'

'না। আরো ভাব। এসে সব শুনব। আমি চলি।'

ছোঁ মেরে মুখে খাবার নিয়ে কাক যেমন করে উড়ে পালায় নীল প্রায় সেই রকম করেই উড়ে পালাল।

তিনদিন বলে সেই যে নীল ডুব দিল তারপর দেখতে দেখতে আর একটা রবিবার এসে গেল। ওর ফেরার কোন নামই নেই। এদিকে আমাদের বারণ। কোথাও বেরুতে পারি না। সকাল বিকেল গেস্ট হাউসে চুপচাপ বসে থাকা। অবশ্য বাড়ি নির্জন। চট্ করে বাইরের কেউ যে আমাদের দেখে ফেলবে এমন সম্ভাবনা কম। বিশেষ, এখন কেউ এ বাড়িতে আসেই না। মাঝে একদিন রামহরি দত্ত এসেছিলেন। অনাদিবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় উনি বললেন, 'বাড়িটা

রামহরি কিনতে চায়। হঠাৎ কোত্থেকে শুনেছে আমি নাকি ব্যানার্জীসাহেবকে বিশ হাজারে বাড়িটা বিক্রি করব বলেছি। ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

সঙ্গে সঙ্গে তাতন জিভ কেটে ফেলল, 'ওই যাঃ জেঠু, তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি' বলেই রামহরিবাবুকে বলা নীলের বানানো কথাগুলো বলে গেল।

'ওঃ তাই বল। আগে জানলে লোকটাকে একটু খেলানো যেত।'

এ ছাড়া আর যা যেমন চলছিল তাই চলছে। বসে থাকতে থাকতে হাত পায়ে খিল ধরে গেছে। খান ছয়েক বই এনেছিলাম। তাও দুবার করে পড়া হয়ে গেছে। এখন হেমেন্দ্রকুমার রায় নিয়ে বসেছি। তাতন কিন্তু মাঝে মাঝে ঘর থেকে উধাও হয়ে যায়। তারপর ফিরে এসে ইজিচেয়ারে শুয়ে নীলের মত ভুরু কুঁচকে বাগানের দিকে চেয়ে থাকে।

সেদিন রবিবার। অনেকক্ষণ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বসে আছি। নীলের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। এই বনবাসে আমাদের ফেলে রেখে সে যে কোথায় ঘুরছে ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু যতই কাজ থাক আমাদের জন্যে তার একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। এমন কথাও যদি বলে যেত ভালো না লাগলে বা বোর করলে তোরা কলকাতা ফিরে আসতে পারিস। তাহলে কবে আমি চলে যেতাম। নীল বা তাতনের রহস্য টহস্য ভালো লাগতে পারে। তার জন্যে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতে পারে। কিন্তু আমার দ্বারা এসব হয় না। নেহাৎ নীল আমার আজন্মের বন্ধু তাই।

এই সব নানান আজগুবি কথা যখন ভাবছি ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটল একটা অঘটন। যা আমি চিন্তাও করতে পারি নি। টেবিল ল্যাম্পের আলোর নীচে বসে আছি। তাতন আমার সামনে। গল্পের বই পড়ছে। হঠাৎ একটা ক্যাঁচ শব্দ। তাকিয়ে দেখি ধীরে ধীরে জানলার পাল্লাটা ওপরে উঠছে। যখন সেটা সম্পূর্ণ উঠে গেল স্পষ্ট দেখলাম এক ছায়ামূর্তি। ঠিক সেদিন রাতের মত। মূর্তিটা আস্তে আস্তে জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

তারপর একলহমা। ঘরের মধ্যে যেন ওলট পালট হয়ে গেল। তাতন, ওর সেই পুরনো কায়দার এক লাফ। ঠিক ছায়ামূর্তির ঘাড়ে যখন পড় পড়, আমি মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখলাম আগন্তুকের বাঁ হাতটা ছুরির ফলার মত একবার উঠল আর নামল। তারপরই 'উঃ' শব্দ করে তাতন ধরাশায়ী। এবং আগন্তুক নির্বিকার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে জানলাটা বন্ধ করে কট করে সুইচ্‌টা জ্বালল।

পাকা চুল পাকা ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়ি। পরনে প্রিন্স কোট ক্রিম কালারের। কালো প্যাণ্ট। এক হাতে বড় অ্যাটাচি। ভদ্রলোক বেশ শান্ত, গম্ভীর গলায় বললেন, 'লাফটা তাতনের ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু উচিৎ ছিল বুকের ঠিক

মধ্যিখানে পা রাখা। উত্তেজনায় লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং আততায়ীর হাতে পরাজিত। ওঠ্‌রে। খুব লাগেনি ত ?'

ধড়ে প্রাণ এল। নীল। তাতন হাতটা মাসাজ করতে করতে উঠে দাঁড়াল, 'না, খুব লাগেনি। তুমি ও আর জোরে মারোনি। তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমি পারি নাকি ?'

'না পারার কোন কারণ নেই। প্রথম কথা চোখ থেকে চোখ না সরানো আর নিজের মার সম্বন্ধে ডেফিনিট থাকা। দুটোর কোনটাই ছিলনা বলে তুই হেরে গেলি।'

'কিন্তু', এবার আমি বললাম, 'হঠাৎ এইসব উদ্ভট সাজপোষাকে, কি ব্যাপার ?'

'আছে আছে। সুকান্ত দারোগাও প্রথমে আমায় চিনতে পারেনি।'

'যা মেক আপ। চিনবে কার সাধ্যি। এদিকে সুকান্তবাবু ত' দুবেলা করে এসে তোর খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিলেন।'

'বেচারী। ওর পক্ষে এ কেস সলভ্‌ করা সম্ভব হত না। সম্ভব হত না আমার পক্ষেও যদি না তারক প্রামাণিক আমাকে সাহায্য করতেন।'

'তার মানে সব ক্লীয়ার ?'

'সব'!

সুটকেস খুলে কয়েকটা সোয়েটার আর জামাপ্যান্ট বার করে বলল, 'নে নে, সোয়েটার টোয়েটার চাপিয়ে নে। যা ঠাণ্ডা পড়েছে এদিকে।'

'তুই কি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলি ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তাতনবাবু, এই সব ডামাডোলে আমিও ভুলে গিয়েছিলাম, আর তুমিও এড়িয়ে গেছ। আমার লাস্ট টাস্‌কের আন্‌সার কই ? তিনদিনের বদলে কদিন কাটল ?

একটু লজ্জা পেয়ে তাতন বলল, 'কাকু। উত্তরটা দেওয়া হয়নি। ভুলেই গেছ্‌লাম। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে বাঁদরের কটা পা ? বাঁদরের একটাও পা নেই। চারটেই হাত। আর তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল কোন খাঁ সাহেব চীনের রাজা ছিলেন। উত্তরটা হ'ল কুবলাই খাঁ। তিন নম্বর প্রশ্ন সিরাজদ্দৌলার বাবার নাম কি ? সিরাজদ্দৌলার বাবার নাম জৈনুদ্দিন। এ্যাম আই রং ?'

'সেণ্টপার্সেন্ট কারেক্ট। তাহলে এবার একটা ধাঁধাঁ নে। সময়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কারণ কয়েকদিন পরই আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। দু তিন দিনের মধ্যে না পারলে উত্তরটা আমার কাছ থেকে জেনে নিস। বলত এই ছড়াটার কি মানে ? পারলে যা খেতে চাইবি খাওয়াব। চাইনীজ। এখন মন দিয়ে শোন—

কবন্ধ নরেশ ভজেন গুরু
হাজার বাতি জেবলে,
গুরুর অন্তরে আছেন গুরু
সোনার পাখি পেলে।

তাতন বলল, 'আর একবার বল নীলকাকু।'

নীল আর একবার বলল। মনে মনে আমিও মুখস্ত করে নিলাম। তারপর ও বলল, মল্লিকভবনের সব রহস্য এই ছড়াটার মধ্যে। ভাব। আমি একটু অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।'

'এ পোষাকেই যাবি ?'

'পাগল নাকি ? তোদের একটু পরীক্ষা করার জন্যে মেক আপ নিয়েছিলাম।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেকআপ তুলে এ্যাটাচড্ বাথে চলে গেল। ফিরে এল ধোপদুরস্ত নীলাঞ্জন ব্যানার্জী হয়ে। তারপর আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি আর তাতন তখন একটা বিদঘুটে হেঁয়ালীর সামনে।

ফিরল ঘন্টা খানেক পর। মুখের সেই হিজিবিজি রেখাগুলো সরে গেছে। ওর সুন্দর মুখটা এখন বেশ উচ্ছল দেখাচ্ছে। যা দেখে অন্তত আমি বুঝলাম ও জেনে গেছে কে খুনী ? এমনকি খুনীকে ধরার সব প্ল্যান ওর কব্জায়।

নীল বলল 'কিরে মগজ খুলল ?'

'এত তাড়াতাড়ি হয় নাকি। দাঁড়া একটু ভাবি। তা তুই এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলি ?

'মাছ ধরবার সময় মাছ শীকারীরা চার ছড়ায় তা জানিস ?'

'জানি বৈকি।'

'আমিও একটু চার ছড়িয়ে এলাম।'

'তা নয় বুঝলাম। কিন্তু কে ?'

'আর মাত্র কটাদিন ? তারপর তোদের সব কথার উত্তর দেব।'

'বুঝেছি। কিন্তু ধরেই যখন ফেলেছিস এত সময় নিচ্ছিস কেন ?'

'মিনিমাম তিনদিন সময় নিতে হবে বৈকী। তার আগে মনে হয় না বাছাধনেরা কিছু করবে। চারের গন্ধটা ঠিকমত না পেলে মাছ আসবে কেন বল ? তার ওপর দিন দুয়েক পর ঘোর অমাবস্যা। খেলাটা জমবে ভাল। তবে চার পাঁচদিনও লেগে যেতে পারে।

'তোর ফতুয়া আমি পৌঁছে দিয়েছি।'

'জানি। যা সন্দেহ করেছিলাম তাই।'

'কি ?'

'পরে বলব। তাতন, ভূত আর আলোর রহস্য ক্লীয়ার হয়েছে ?

'মনে হয় হয়েছে, তোমাকে শোনানোর জন্যেই আমি ওয়েট করছি, বলব ?'

'না। হাতে নাতে কাজ দেখতে চাই। কাল বারোটা থেকে প্রতিদিনই ঐ পয়েন্টে তোর সব খেল্। তোকে কি কি করতে হবে কাল সকালে জানিয়ে দেব। অজু জালে মাছ যতক্ষণ না ধরা পড়ছে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা তোর একমাত্র কাজ তুই অনাদিবাবু ছাড়া দুনিয়ার আর কারো দিকে নজর রাখবি না। ছায়ার মত ওঁর পেছনে লেগে থাকবি। বাকী কাজ আমার আর সুকান্ত দারোগার। দেখি সুকান্ত দারোগা কতটা তৎপর হতে পারে।'

'কিন্তু সব যে হেঁয়ালী রে ?'

'তার আগে ছড়ার হেঁয়ালীটা ক্লীয়ার কর। আমার অনুমান আজ রাত্তিরটা ঘুমতে পারব। বাকীটা আপসেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে। শম্ভু খাবার দিয়ে গেলে ডাকিস।'

চাদরটা টেনে নিয়ে নীল বিছানায় ঢুকে পড়ল।

সে রাত্রে সত্যিই কিছু ঘটল না। তবু নীল আমাকে অনাদিবাবুর ওপর লক্ষ্য রাখতে বলেছে। রাত্রে দু-তিনবার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। আর প্রতিবারই আমি জানলার পাল্লা সরিয়ে অনাদিবাবুর ঘরের দিকে তাকিয়ে থেকেছি দশ পনের মিনিট। কিন্তু কোন বিসদৃশ কিছুই চোখে পড়ে নি। যদিও এটা বুঝতে পারছিলাম এতদূর থেকে অনাদিবাবুর ঘরের দিকে তাকিয়ে থেকে বিশেষ কিছুই আমি লক্ষ্য করতে পারব না। তবু যদি কিছু চোখে পড়ে এই আশায়। কিন্তু না। কিছুই চোখে পড়েনি।

পরদিন সকাল থেকেই মনে মনে বিরাট উত্তেজনা। নীলের গতরাত্রের কথাবার্তায় যা মনে হল এই সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত কিছু জট পরিস্কার হয়ে যাবে। যে কোনদিন রাত্রে একটা হেস্তনেস্ত হতে পারে। উত্তেজনা কেবল আমার একার মধ্যে না, তাতনেরও তাই। একবারত' ও বলেই ফেলল, 'আঃ রাত্তিরগুলো এত দেরী করে আসে কেন বলত জয়কাকু।'

নীল কিন্তু নির্বিকার। ওর মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। কোন চাঞ্চল্যও দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তৎপরতা ছিল। ভোরবেলা আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই ও কোথায় যেন বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরল দুপুরে। আমি তখন

চান করতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি ও তাতনকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে তাতন শুনছে আর ঘাড় নাড়ছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করেই ফের নীল বেরিয়ে গেল। যাবার সময় আমাদের বলে গেল যাকে যা বলা আছে সে তাই করবে। আমি ফিরি বা না ফিরি তার জন্যে কেউ অপেক্ষা করবে না।

কোনরকমে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত তাতন কলে আটকানো ইঁদুরের মতো ছটফট করল। তারপর 'আসছি' বলেই হাওয়া। কোথায় গেল কিছুই বলে গেল না। আরো আধঘণ্টা অপেক্ষা করে যখন নীলও এল না তাতনও এলনা তখন আমি বেরিয়ে পড়লাম অনাদিবাবুর উদ্দেশে।

অনাদিবাবুকে চোখে চোখে রাখতে হবে? কেন কি জন্যে তার কিছুই বলেনি। আমি ত' মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা। শেষপর্যন্ত অনাদিবাবুই খুনী নাকি? কিন্তু সুন্দরীকে খুন করায় অনাদিবাবুর কি স্বার্থ? তারপর অনাদিবাবুই যদি খুন করতে চান তাহলে উনি আমাদের ডেকে আনলেন কেন? যেচে কেউ নিজের কবর নিজে খোঁড়ে? নাকি অনাদিবাবুর সামনে কোন বিপদ? কেউ ওকে মারতে চায়? তাই যদি চায় তাহলে আমাকে বডিগার্ড রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ হয় না। সামনা সামনি কেউ যদি ভোজালী নিয়ে অনাদিবাবুর সামনে দাঁড়ায় বা পেছন থেকে পিস্তল চালায় তাহলে আমার সাধ্য নেই ওঁকে বাঁচাই।

তবে এক্ষেত্রে নীলের উদ্দেশ্য বোঝা দায়। ও কোন্ রাস্তায় ওর ঘুঁটি চালছে তা আমার বুদ্ধির বাইরে।

যাইহোক বেরিয়ে পড়লাম। এবং বেরুবার আগে নীল যা করতে বলেছিল তাই করে গেলাম। আলোটা জ্বালানো ছিল। সেটা নিভিয়ে দিলাম। সাদা দাড়িগোঁফ আর সাদা চুল লাগানো অবস্থায় কেন নীল গতকাল রাত্রে ফিরেছিল সেটা পরে বুঝেছিলাম। ভি.আই.পি ব্যাগের মধ্যে একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে এসেছিল। একটা কেস সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার আর নীলের কিছু কথা-বার্ত্তার রেকর্ডিং-এর একটা ক্যাসেটও সঙ্গে এনেছিল।

আলোটা নিভিয়ে জানলার পাল্লাটা ফেলে দিলাম। জানলার পাল্লার সঙ্গে লাগানো একটা সুতোর অন্য প্রান্তে লাগানো ছিল একটা ছোট্ট হুক। এমন কায়দা করে ব্যাপারটা ও সেট করেছিল যে বাইরে থেকে কেউ যদি জানলার পাল্লা তোলে পাল্লার গায়ে লাগানো সুতোর টানে অন্যপ্রান্তে লাগানো হুক রেকর্ডিং-এর নবটা টেনে দেবে এবং ধীরে ধীরে টেপটা বাজতে শুরু করবে। টেপের ওপর একটা হাল্কা কম্বল চাপা দেওয়ার জন্যে বাইরে থেকে কেউ অন্ধকার ঘরে কান পাতলে শুনতে পাবে ঘরের মধ্যে চাপা স্বরে দুজনে কথা বলছে।
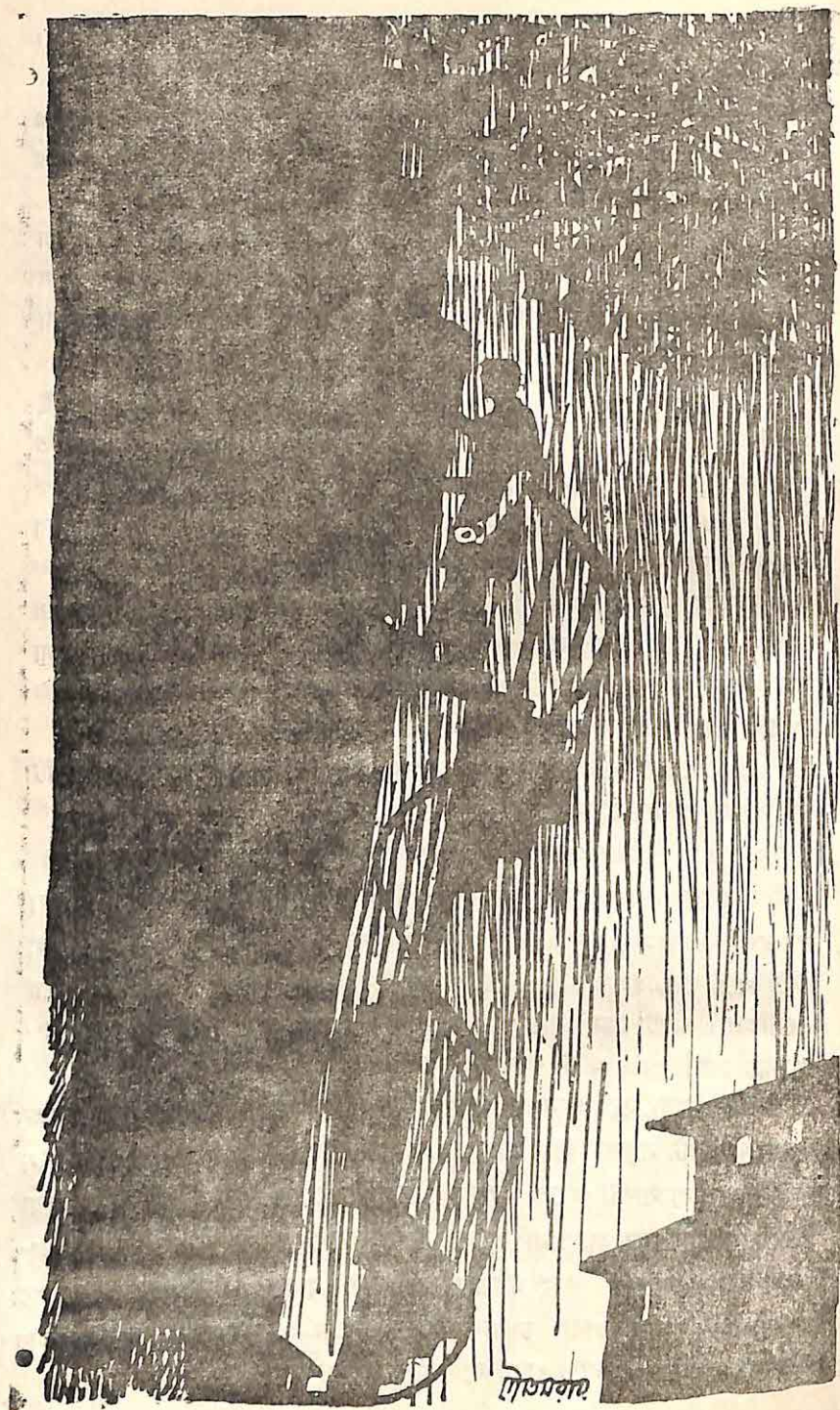
কেন ? আমি তা জানিনা। আমায় যা করতে বলেছে তাই করে বেরিয়ে গেলাম।

খুব সন্তর্পণে নিজেকে লুকিয়ে একতলার বাগান থেকে উঠে যাওয়া সেই ঘোরানো সিঁড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাধারণত এদিকটা অন্ধকারই থাকে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে কেউ এদিকের সিঁড়ি ব্যবহার করে না। আশপাশ ভালো করে লক্ষ্য করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। একে এখন অমাবস্যা চলছে। তায় এদিকে আলো নেই। তার ওপর কালো প্যাণ্ট আর কালো গরমের পুল ওভার। স্বভাবতই আমায় কেউ দেখতে পায়নি। কিন্তু একতলা থেকে দোতলায় উঠেই হল ফ্যাসাদ। ওপাশ থেকে দোতলার দরজা বন্ধ। কি করব যখন ভাবছি খুট করে একটা শব্দ হল। দরজা ফাঁক করতেই তাতনের মুখ ভেসে উঠল। ও কিন্তু একটাও কথা বলল না। দোতলার বারান্দায় আলো ছিল না। হঠাৎ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল কোন প্রশ্ন করার আগেই।

একটু আগে আমার ভাবনাটা নস্যাৎ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম আমায় কেউ দেখতে পায়নি। কিন্তু তাতন যে আমার গতিবিধি লক্ষ্য রেখেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আমার গতিবিধি ইচ্ছে করলেই যে কেউ নজর করতে পারে।

এখন আর ভেবে কি হবে ? ধীরে ধীরে ছোট্ট প্যাসেজ ধরে উপর দিকের বারান্দায় চলে গেলাম।

বারান্দায় কোন আলো জ্বলছে না। ফুলের টবগুলোকে পাশকাটিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ালাম অনাদিবাবুর ঘরের সামনে। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম উনি একমনে একটা বই পড়ছেন।

কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম মনে নেই। আমার ঘড়ির ডায়াল রেডিয়াম দেওয়া নয়। সময় দেখা সম্ভব হয় নি। ইতিমধ্যে শম্ভু ঝিমোতে ঝিমোতে এসে খাবার চাপা দিয়ে গেছে। অনাদিবাবু খাওয়া দাওয়া করেছেন। এক সময় আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

হঠাৎ পিঠে টোকা পড়তে চমকে উঠেছিলাম। কারণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। মেঝের ওপরই বসে পড়েছিলাম। আর স্বভাবতই বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনী এসেছিল। চমকে তাকিয়ে দেখি নীল।

'যা তুই শুয়ে পড়গে যা। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'আর তুই ?'

'একটু পরে যাচ্ছি। মনে হয় আজ আর কিছু হ'ল না।'

'কিন্তু তাতন ?'

'ঘোরানো সিঁড়ির মুখটায় তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। ওকেও নিয়ে যাস।'

কিছু না বলে চলে এলাম তাতনকে নিয়ে। ঘরের আলো জ্বালিয়ে চমকে উঠলাম। রাত প্রায় তিনটে। সর্বনাশ। রাত আটটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে এবং বসে ছিলাম। নিজের ধৈর্যের জন্যে নিজেকেই প্রশংসা করতে ইচ্ছে করল। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা আগেই সারা ছিল। একগ্লাস করে জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। নীল কখন ফিরেছিল জানি না।

এই ভাবে কেটে গেল আরো তিনদিন। নীল বলেছিল দিন তিনেকের আগে কিছু ঘটবে না। ঘটলও না।

ঘটল পাঁচদিনের দিন। একটা বিরাট মেশিনের একটা নাটবল্টুর মত আমার অ্যাকটিভিটি। আগা পাশ বা তলা কিছুই জানিনা। কেবল আড়াল থেকে অনাদিবাবুকে লক্ষ্য করে যাই।

পাঁচদিনের দিন। মানে শুক্রবার। প্রতিদিনের মত সেদিনও ঠিক সেই সময় সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। অন্ধকারে একা একা উদ্দেশ্য বা পরিণতি-বিহীন অপেক্ষা করার মত বোরিং কাজ আর হয় না। এই বোরডাম কাটাবার জন্যে আমার হাতে একটা মোক্ষম চাল ছিল। সেটা হল সেই ধাঁধাটা। কবন্ধ নরেশ ভজেন গুরু হাজার বাতি জেবলে—।

এখনও মানে খুঁজে পাইনি। একবার অমাবস্যার কালো আকাশ আর একবার অনাদিবাবুর ঘর, তাকিয়েছি আর ভেবেছি কি মানে হতে পারে 'গুরুর অন্তরে আছেন গুরু সোনার পাখি পেলে—।'

ভাবছি আর ভাবছি। যাও বা সামান্য ছিঁটে ফোঁটা আলো এসে পড়ছিল অনাদিবাবুর ঘর থেকে, সেটা নিভে যাবার পর এখন নিরেট অন্ধকার। নিজের হাত নিজেই দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হল। মুহূর্তে ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল। তবে কি এতদিনে প্রতীক্ষার সব শেষ। কিন্তু তখন আর অত কিছু ভাবার সময় ছিল না। অন্ধকারের মধ্যেই দেখলাম সেই বারান্দার লাগোয়া অনাদিবাবুর ঘর সংলগ্ন দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল। এত অন্ধকার কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। তবে অনুমান, এক ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। অর্থাৎ আমি এখন ঠিক পিছনে। এখন আমার কি কর্তব্য বুঝতে পারলাম না। কে এই ছায়ামূর্তি ? এত রাত্রে ছাদের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে অনাদিবাবুর ঘরে ঢুকছে কেন ? নীল নাকি ? কিন্তু নীল হবেই বা কেন ? ও এলে চোরের মত আসবে কেন ? তাছাড়া নীল হলে ত' আমাকে প্রতিদিনের মত ডেকেই দিত। নিশ্চয় নীল না।

একবার মনে হল পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু নীল বিনা প্রয়োজনে কোন রিস্কি অ্যাকশনে যেতে বারণ করেছিল। রিস্কি অ্যাকশন ত' বটেই। কারণ যে লোক এই রকম চোরের মত নিঃশব্দে বাইরে থেকে খিল খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে তার হাতে কোন অস্ত্র নেই তা ভাবাই যায় না। আর আমার হাত একদম ফাঁকা। মাত্র একটা পেন্সিল টর্চ ছাড়া। কলকাতা থেকে ফেরার সময় নীল অবশ্য বড় দুটো টর্চ এনেছিল। একটা তাতনকে দিয়েছে। একটা ও-নিজে রেখেছে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। লক্ষ্য করা ছাড়া আর আমার কিছুই করার ছিল না। বেগতিক দেখলে চীৎকার।

আবার একটা খুট করে শব্দ হল। একটা আধুলির সাইজের গোল আলো মাটির ওপর পড়ল। ছায়ামূর্তি টর্চ জ্বালিয়েছে। টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ও বিছানার ওপর ফেলল। অনাদিবাবু অঘোরে ঘুমচ্ছেন। সরিয়ে নিয়ে এল টর্চের আলোটা। তারপর সেটাকে নিয়ে ফেলল ঘরের এক কোণে রাখা বুদ্ধ-মূর্তিটার ওপর। সামান্য আলোতেই সোনালী পাথরের মূর্তিটা চকচক করে উঠল। ধীর পায়ে সে এগিয়ে চলল মূর্তিটার দিকে। কোথাও কোন শব্দ নেই। কেবল অনাদিবাবুর বড় দেওয়াল ঘড়িটা টিকটিক আওয়াজ করে চলেছে।

মূর্তিটার কাছে গিয়ে লোকটা থামল। আবার আলোটা ফেলল মূর্তির গায়ে। কয়েক সেকেন্ড আলোটা ঐ অবস্থায় ধরে রাখল। তারপর আলো নিবিয়ে মূর্তিটা তুলে নিল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কট্ করে একটা আওয়াজ পেলাম। একটা ঘসঘস শব্দ তারপর অদ্ভুত এক আলোর খেলা দেখতে পেলাম। এতদিন অনাদিবাবুর মুখ থেকে শুনেছিলাম। আজ স্বচক্ষে দেখলাম। হাল্কা একটা লাল আলো ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, এবং ধীরে ধীরে আলোটা বাড়তে শুরু করল। সামনের বিরাট আয়নার ওপর পড়ে সেই আলোটা আরো প্রকট হয়ে ফুটে উঠতে শুরু করল। লোকটাকে এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। এও কি সম্ভব?

হঠাৎ আলোটা এসে পড়ায় লোকটাও কয়েক সেকেন্ডের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়ল। একবার রোষ কষায়িত চোখে সামনের কাঁচের ফ্রেসকোর দিকে তাকাল। তারপর একবার ওপরের লাইটপাসারের দিকে তাকাল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপরই ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইল যে পথ দিয়ে এসেছিল।

কোথায় যে ছিল তাতন! ব্রুসলীর লাফ। হাত থেকে ছিট্কে পড়ল বুদ্ধমূর্তি। একেবারে অনাদিবাবুর খাটের ওপর। ধড়মড় করে 'কে' 'কে' বলে লাফিয়ে উঠলেন অনাদিবাবু। তখনও তাঁর ঘুমের চট্কা ভাঙেনি।
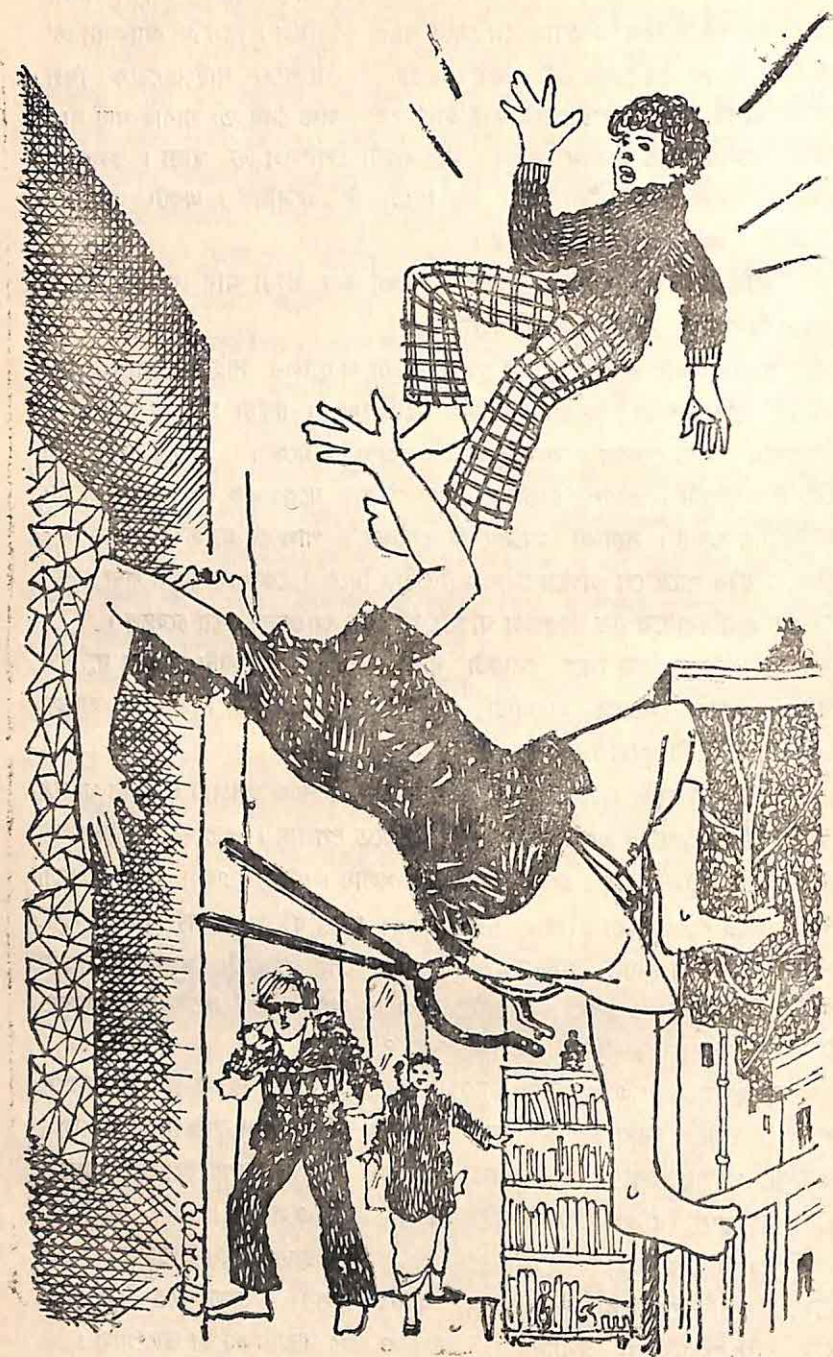
অতর্কিত আক্রমণ লোকটা সামলে নিয়েই উঠে দাঁড়াল। চকিতে পিঠের কাছে হাতটা নিয়ে গিয়ে কি যেন টেনে বার করল। সেই আলোয় আমি স্পষ্ট দেখলাম তার হাতে একটা দেড় হাত লম্বা সাঁড়াশী। সাঁড়াশীর দুটো হাতল ধরে সে তাতনের দিকে এগোচ্ছে। তাতনের সম্পূর্ণ ক্যারাটে পোজ। অনাদি-বাবু হতভম্ব।

লোকটা যখন এগিয়ে প্রায় তাতনের কাছাকাছি তক্ষুনি দক্ষিণ দিকের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল নীল। তার হাতে উদ্যত পিস্তল।

ওকে বলতে শুনলাম, 'ও চেষ্টা করে কোন লাভ নেই শম্ভু। সাঁড়াশীটা ফেলে দাও।'

একে নীলের গম্ভীর গলা। তার ওপর এখন তা বেশ ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুরের মত শোনাচ্ছে।

বোধহয় এতটার জন্যে শম্ভু প্রস্তুত ছিল না। 'কে' বলে যেই মাত্র পেছন দিকে তাকিয়েছে, আবার ব্রুসলী। ডানপায়ের লাথি সজোরে গিয়ে পেঁাছেছে শম্ভুর হাতে। ছিটকে পড়ে গেছে সাঁড়াশী। একদিকে উদ্যত পিস্তল। অন্যদিকে তাতন। হাতেও অস্ত্র নেই। অগত্যা মরিয়া হয়ে উত্তরের বারান্দার দিকে পিছু হটা শুরু করল শম্ভু। কিন্তু ও জানত না পেছনেই আমি। এই আমি জীবনে প্রথম একজন সাংঘাতিক খুনীকে নিজে জাপটে ধরলাম। ওর বগলের দু পাশ থেকে আমার দুটো হাত ঢুকিয়ে নিমেষের মধ্যে ঘাড়টা চেপে ধরলাম। ব্যাস্ শম্ভু নট নড়ন নট চড়ন! কেবল ওকে বলতে শুনলাম 'এসব কি ব্যাপার, অ্যাঁ, এসব কি ছোটলোকমী?'

বাঁ হাতে পিস্তলটা উঁচিয়ে রেখেই নীল একেবারে ওর কাছে চলে এল। ডানহাত দিয়ে নিজের পকেট থেকে টেনে বার করল একটা হাতকড়া। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে চেপে রেখেছিলাম। কিন্তু লোকটার গায়ে মনে হয় অসুরের মত শক্তি। নীল যদি সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতে সেই হাতকড়াটা না লাগিয়ে দিত তাহলে আমার পক্ষে বেশীক্ষণ ওকে ধরে রাখা সম্ভব হত না।

হাতকড়া লাগিয়ে হাসতে হাসতে নীল বলল, 'তাতন ওয়েলডান। যা আলোর ভেল্কিটা নিবিয়ে দিয়ে আয়। তারপর শম্ভুবাবু, এসব কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করছিলেন না? শুনুন অনাদিবাবু, নিশ্চয় আপনি বেশ আশ্চর্য হয়েছেন। হবারই কথা। আপাতত আপনার কুকুর টমি আর আপনার বাড়ির কাজ করার লোক সুন্দরীকে হত্যা করা এবং ঐ বুদ্ধমূর্তিটা চুরী করার অপরাধে ওকে আমি পুলিসের পক্ষ থেকে গ্রেপ্তার করলাম।'

শম্ভু খিঁচিয়ে উঠল, 'ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু, এর শোধ আমি তুলবই। শালা টিকটিকির বাচ্চা।'

এসব ব্যাপারে নীলের কোন রাগ থাকে না। ও টিপে টিপে হাসতে হাসতে বলল, 'শম্ভুবাবু এ বাড়িতে চাকরের ছদ্মবেশে থাকলেও আমি জানি আপনার আসল পরিচয় কি। তাই আমি আপনাকে সম্মান দিয়ে 'আপনি' করে বলছি। ভদ্রবংশে জন্মেছেন, মুখের ভাষাটাও একটু ভদ্র করুন।'

'যা যা বেশী বাজে বকিস না। আগে হাত থেকে এটা খোল্। তারপর ভদ্রভাবে কথা।'

'সরি। ওটা খোলা যাচ্ছে না।'

'কি প্রমাণ আছে আমি ওদের খুন করেছি ?'

'প্রমাণ না নিয়ে নীলাঞ্জন ব্যানার্জী কোন অ্যাকশান নেয় না।'

চীৎকার করে ওঠে শম্ভু, 'তোর এগেনস্টে আমি মামলা করব। তোকে যদি না আমি ঘানি টানাই ত' আমার নাম—

'বলুন বলুন, থামলেন কেন ? আসল নামটা বলে ফেলুন। না সেটাও আমি বলে দোব ? নাকি আপনার বাবা এলে তাঁর মুখ থেকেই আপনার নিজের আসল নামটা শুনবেন ?'

এতক্ষণে অনাদিবাবু বোধহয় সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন, 'আপনার কথা ত' আমি কিছুই বুঝছি না ব্যানার্জী সাহেব ? শম্ভুই বা কে ? তার বাবাকেই বা পেলেন কোথা থেকে ?'

'দারোগা সুকান্ত দাস যদি তীরে এসে তরী না ডোবান তাহলে এতক্ষণে তিনি শম্ভুর বাবা আর এদের কুকর্মের প্রধান সঙ্গী দুজনকেই হাতকড়া পরাতে পেরেছেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

'আপনার বিশ্বাসের আমি অমর্যাদা করিনি স্যার। এই নিন আপনার আসামীদের। অত্যন্ত সন্দেহজনক কেস স্যার। বুঝতেই পারিনি শেষ পর্যন্ত এরা—?' পিস্তল হাতে সুকান্ত দাস ভারী বুটের আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে আরো অনেকগুলো বুটের আওয়াজ।

একে একে সবাই ঘরে ঢুকলেন। চমকের পর চমক। শুধু আমি না। অনাদিবাবু এমন কি তাতনও। আলোর খেলা থামিয়ে তাতন ইতিমধ্যেই ঘরে ফিরে এসেছিল।

'সর্বনাশ ? এঁরা মানে, এসব আপনি কি করেছেন ব্যানার্জী সাহেব ? শেষ কালে একটা যাচ্ছেতাই কেলেংকারী হয়ে যাবে নাত ?'

ফস্ করে তাতন বলে উঠল, 'ভুলে যেও না জেঠু, ওঁর নাম নীলাঞ্জন ব্যানার্জী। ওঁর ঐ মাথার বুদ্ধি তোমার চিন্তার বাইরে ?'

হঠাৎ ফুঁসিয়ে উঠলেন বন্দীদের একজন, 'কাজটা অনাদিবাবু, ভালো হচ্ছে না কিন্তু। মনে রাখবেন বাঘের মুখে হাত পুরেছেন—।

এখন বাঘটিকে চিনলাম। রামহরি দত্ত। আর পিছনের ভদ্রলোক জাপানী ডল বিজন দাস। তিনিও ফুঁসছেন। 'নিজের মনে মনে।'

নীল জিজ্ঞাসা করল, 'মহাপ্রভুরা কি খুব বেগ দিয়েছিল ?'

সুকান্ত দাস বললেন, 'একদম না স্যার। দুজনকেই স্টেশনে পাওয়া গেছে। অত্যন্ত সন্দেহজনক ভাবে স্টেশনের পেছনে বাবলা গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল বিজনবাবু। আর ইনি মানে রামহরি দত্ত একটা রিক্সার মধ্যে পর্দা টেনে বসেছিলেন। বিজনবাবুর হাতে ছিল এই সুটকেসটা। কিন্তু স্যার, 'সাধু মানে সেই বিজনবাবুর চাকরটা ?' অত্যন্ত সন্দেহজনক—। কোথাও খুঁজে পেলাম না। অবশ্য স্টেশনের চারদিকে আমার লোক থিক্‌থিক্‌ করছে। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই এ্যারেস্ট করবে।'

নীল একটু হেসে বলল, 'তাকে পেতে গেলে, যে গেস্টহাউসে আমরা উঠেছি সেখানেই পাবেন—হাতপা আর মুখ বেশ ভাল করে বাঁধা আছে। আর শুনুন, বলে নীল পকেট থেকে একটা খাম বার করে দারোগার হাতে দিয়ে বলল, 'এতে আমাকে লেখা দুখানা হুঁশিয়ারি ছড়া আছে যার সঙ্গে আপনি মিল খুঁজে পাবেন সাধুর লেখা একখানা চিঠির। জোর করে আমি চিঠিখানা সাধুকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলাম ওর হাতের লেখার নমুনার জন্যে। ওতে লেখা আছে তিনটে শব্দ 'রামহরিবাবু, সময় নেই, পালান।'

'আমি ত' ছাঁইপাশ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না' বলেই ধপ্‌ করে বসে পড়লেন অনাদিবাবু।

'সব বুঝবেন। সকালটা হতে দিন।'

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ধীরে ধীরে ভোর হয়ে আসছে। আকাশের কালো রঙটা কোন অদৃশ্য আঁকিয়ে যেন ইরেজার দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে দিচ্ছে।

অনাদিবাবুর নীচের তলার বৈঠকখানায় সবাই এসেছেন। হ্যোমিওপ্যাথ তারিনী সেন। যদিও তিনি ঢুলছিলেন। এসেছেন সুকোমল ভট্টাচার্য। টেস্ট খেলা শেষ হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়া জিতেছে। বোধ হয় সেই আনন্দে এবং এতবড় একটা রহস্যের শেষটুকু জানার আগ্রহে তুহিন কর আর বিমল রায় অফিস

ডুব দিয়েছে। যে নীলমণি পাকড়াশী সেদিন বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনিও এসেছেন। সবশেষে এলেন 'হুঁঃ'। কড়া চুরোটের ধোঁয়া উড়িয়ে। এসেই ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন নীলের দিকে। বললেন, 'তুমি আমার ছেলের বয়েসী। আজ তোমাকে আর আপনি বলতে পারছি না। কনগ্রাচুলেশন মাই ইয়ংগার ফ্রেন্ড। তোমার মুখ থেকে সব শুনব বলেই চলে এলাম। নাউ স্টার্ট ইওর স্টোরী।'

অনাদিবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন, হাতে ট্রে। সিংগাড়া আর বিস্কিট। তাতন আর বাগানের মালী, দুজনে চা তৈরী করছিল। সুন্দরীর মা শয্যাশায়ী। তিন দিন হল তার জ্বর। ওর স্বামী এখন দিনরাত ওর কাছেই থাকে। অনাদিবাবুকে বলে নীল সুন্দরীর বাবাকে এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

চা আসতে আমি এগিয়ে গিয়েঃপরিবেশনের কাজটা এগিয়ে দিলাম।

এই আসরে এখন যাঁরা নেই তাঁরা হলেন, শম্ভু, রামহরি দত্ত, বিজন দাস। ওরা এখন থানার স্পেশাল লক-আপে। দারোগা সুকান্ত দাসের জিম্মায়।

একটা সিংগাড়ায় কামড় দিয়ে তুহিন বলল, 'দাদা, আর আমাদের অ্যাংজাইটির মধ্যে রাখবেন না। দয়া করে কেস ক্লীয়ার করুন।'

নীল মৃদু হাসল। তারপর বলল, 'একটু গুছিয়ে নিচ্ছি। কোথা দিয়ে শুরু করবো! সে এক দীর্ঘ কাহিনী। তার আগে এই বুদ্ধমূর্তিটা দেখুন।'

এই বলে সাদা পাথরের সেণ্টার টেবিলের উপর রাখা পাকা গম রঙের সোনালী পাথরের বুদ্ধদেবের মূর্তির দিকে তর্জনী নির্দেশ করে দেখাল। প্রত্যেকের দৃষ্টি তখন সেই বুদ্ধমূর্তির ওপর। শিল্পকর্মের দিক থেকে মূর্তিটা অপূর্ব। বিমল রায় কনুয়ের গুঁতো দিয়ে ঢুলন্ত তারিণী সেনকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তারিণীদা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই লাইফটা কাটিয়ে দিলেন। একটু চেয়ে দেখুন কি সুন্দর মূর্তিটা।'

তারিণীবাবু একবার ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমরা দেখ হে ছোকরারা। ওসব আমার অনেক দেখা আছে।' বলেই তিনি আবার ঘাড় ভাঙা বুড়ো হয়ে গেলেন।

সেদিকে না তাকিয়ে নীল আরম্ভ করল, 'অহিংসা, শান্তি আর ভালবাসার অমর বাণী ছড়িয়েছিলেন যে মহাপুরুষ, তিনি কি ভুলেও কোনদিন ভাবতে পেরেছিলেন যে তাঁরই একটি প্রতিমূর্তিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে হিংসা মৃত্যু আর লোভের ছায়া নেমে আসবে? কিন্তু তাই হয়েছিল। জানি না অতীতে আরো কত মৃত্যু ঘটেছে এই মূর্তিকে কেন্দ্র করে, কিন্তু চোখের সামনে তিন তিনটে খুনের ইতিহাস আমার জানা।'

হঠাৎ সুকোমলবাবু বললেন, 'কি আছে মিঃ ব্যানার্জী ঐ মূর্তির মধ্যে যার জন্যে তিন তিনটে প্রাণের মৃত্যু হল ?'

নীল মৃদু হেসে বলল, 'সেই আদি অকৃত্রিম সব অনর্থের মূল অর্থ। ঐ মূর্তির মধ্যে আছে রাজার ঐশ্বর্য।'

'বলেন কি ?' আওয়াজটা এল আমার পাশ থেকে। বললেন নীলমণি পাকড়াশী।

'হ্যাঁ নীলমণিবাবু, যা বলছি সব সত্যি। ঐটুকু মাত্র, একহাত লম্বা আর এক ফুট চওড়া মূর্তির দাম কম করেও বেশ কয়েক লক্ষ টাকা।'

'বোআব্বা' এবারও নীলমণি পাকড়াশী। তাঁর চোখ বিস্ফারিত। মুখ প্রায় হাঁ।

'হুঁঃ' বলে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কড়া তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে তারক প্রামাণিক বললেন, 'খামোকা দেরি কোরো না ব্যানার্জী। তোমার গল্প শোনাও। আর আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, মিঃ ব্যানার্জীর কথা চলাকালীন কেউ কোন প্রশ্ন করবেন না।'

একমাত্র নীলমণিবাবু ছাড়া আর সবাই সমস্বরে তারক প্রামাণিকের কথায় সায় দিলেন। এরপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘরের মধ্যে নেমে এল অখণ্ড নীরবতা। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নীল বলতে শুরু করল, 'এই মূর্তির জন্ম থেকে মল্লিক পরিবারের কোন এক পূর্বপুরুষের হাতে আসা পর্যন্ত যে একটা বিরাট কাহিনী লুকিয়ে আছে তা আমাকে অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলতে হচ্ছে। ঐতিহাসিক সত্য যেটুকু পেয়েছি তাও নেহাৎই খাপছাড়া। খানিকটা মল্লিক পরিবারের রামমাণিক্যবাবুর মুখ থেকে শোনা খানিকটা একটা পুঁথির কিছু উই-এ খাওয়া পাণ্ডুলিপির ভগ্নাবশেষ থেকে। পুঁথিটা পাওয়া গেছে এই বাড়িরই একটা পরিত্যক্ত ঘর থেকে। আমার হাতে এসেছে অনাদিবাবু মারফৎ। বাড়িটা কেনার পর মাটির নীচের একটা চোরাকুঠুরি উনি প্রায় আবিষ্কারই করে ফেলেছিলেন। সেখান থেকে অনেক হাবিজাবি জিনিসের সঙ্গে ঐ পুঁথির ছেঁড়া অংশগুলো পাওয়া যায়। অনাদিবাবুকে ধন্যবাদ বাজে জিনিস ভেবে এই অমূল্য জিনিষটা উনি জঞ্জালের গাদায় ফেলে দেননি। তাহলে কোনদিনও মল্লিক বাড়ির ভূতের রহস্যের সমাধান হোতনা। কেউ কোনদিন জানতেও পারত না কেন তিন তিনটে খুন হল।'

'তিনটে খুন আবার—' বলেই মস্ত জিভ বার করে নীলমণিবাবু চোখ বন্ধ করলেন। এবং মুখও। নীল ওঁর দিকে একবার তাকিয়ে বলে চলল, 'প্রশ্নটা আপনি ঠিকই করেছেন নীলমণিবাবু। তিনটে খুন আবার হল কখন ? সুন্দরী খুন হয়েছে এটা সবাই জানেন। কিন্তু কুকুর হলেও টমিকে খুন করা হয়েছে।

সেটাও একটা প্রাণ। আর একটা খুন এ বাড়িতে ঘটেছিল। আজ থেকে প্রায় বছর পনের ষোল আগে। এই মল্লিক বাড়ির সেদিনের গিন্নীমা। মানে মল্লিক বংশের শেষ জমিদার রামমাণিক্য মল্লিকের স্ত্রী।'

'যাঃ সে তো আত্মহত্যা ?' বললেন তারিণী সেন। তার মানে উনি ঢুলছেন। কিন্তু ঘুমচ্ছেন না ?

'না তারিণীদা' নীল প্রতিবাদ জানাল বেশ গম্ভীর গলায়, 'আপনাদের তাই জানানো হয়েছিল। রামমাণিক্যবাবুর স্ত্রীকে সেদিন ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সে কথায় পরে আসছি। তবে শুনে রাখুন ঐ বুদ্ধ মূর্তির কারণেই সেদিন তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। যাক যা বলছিলাম, বুদ্ধমূর্তির প্রাচীন ইতিহাস কিছুটা রামমাণিক্যবাবুর কাছে শোনা, কিছুটা হেলপ করেছে পুঁথির ছেঁড়া অংশ আগেই বলেছি, গল্পটা ভরাট করছি আমার অনুমান দিয়ে।

'এবার আপনারা একটা হেঁয়ালী শুনুন। হেঁয়ালী বা ছড়াটা আমি পেয়েছি রামমাণিক্যবাবুর কাছ থেকে। এবাড়ি ছেড়ে যখন তিনি চলে যান প্রায় খালি হাতেই চলে গিয়েছিলেন। কেননা তখন তিনি প্রায় দেউলিয়া। কিন্তু যাবার সময় নিয়ে গিয়েছিলেন রুপোর একটা থালা। সেটা এই বংশেরই সম্পত্তি। সেখানেই লেখা ছিল ছড়াটা। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। কেবল পাওয়ার ইতিহাসটা জানালাম। হেঁয়ালীটার মধ্যেও কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্কেত দেওয়া আছে। যার থেকেও বোঝা যাবে আমার অনুমানটা খুব একটা সাজানো না। হেঁয়ালীর ব্যাখ্যাটা পরে করলেও চলত। কিন্তু এখনই শুনিয়ে রাখছি বোঝার সুবিধার জন্য। হেঁয়ালীটা এই রকম,

কবন্ধ নরেশ ভজেন গুরু,
হাজার বাতি জেবলে।
গুরুর অন্তরে আছেন গুরু,
সোনার পাখি পেলে॥

'হেঁয়ালীর ব্যাখ্যায় এখুনি আসছি না। কেবল এই হেঁয়ালীর দুটো শব্দ ইতিহাসের সন্ধান দিচ্ছে। তা হল 'কবন্ধ নরেশ।

'বলতে পারেন ইতিহাসে কবন্ধ নরেশ কে ? কবন্ধ মানে যার ধড় আছে মাথা নেই। আর নরেশ মানে নরপতি বা রাজা। ইতিহাসে কে সেই রাজা যার আমরা মাথা দেখতে পাই না ?'

ফস্ করে এবার তাতন বলে উঠল 'সম্রাট কণিষ্ক।'

'কারেক্ট। এই কণিষ্ক 'থেকেই বোধহয় এই কাহিনী শুরু। প্রচণ্ড শিল্পানুরাগী রাজা কণিষ্ক ছিলেন বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত। বৌদ্ধধর্মের একটা

শাখা 'মহাযানের' প্রবর্তক ছিলেন আচার্য নাগার্জুন। আর প্রচারক ছিলেন কণিষ্ক। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে তিনি দুহাতে খরচও করতেন। একদিকে বিলাসী এবং সূক্ষ্ম শিল্পের প্রতি অনুরাগী রাজা কণিষ্ক তৈরী করালেন এক মনোরম এবং মহামূল্যবান হীরের বুদ্ধমূর্তি। এ পৃথিবীতে যে মূর্তির আর জোড়া নেই। হীরেটার সাইজ ধরুন কোহিনুরের মত। সেই হীরে কেটে খোদাই করে বার করে আনা হল আড়াই সেন্টিমিটার বাই দুই সেঃ মিঃ চওড়া বুদ্ধের এক প্রতিমূর্তি। সেটা থাকত সম্রাটের নিজস্ব কোষাগারে।

'এই ধরনের হীরের বুদ্ধমূর্তি তৈরী করা বোধহয় একমাত্র রাজা কণিষ্কের পক্ষেই সম্ভব ছিল। ছড়াটা কে তৈরী করেছিল জানি না। তবে কবন্ধ রাজের উল্লেখ রাজা কণিষ্কের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। খুব সম্ভবত প্রতি বুদ্ধ পূর্ণিমায় কণিষ্ক সেই বুদ্ধমূর্তির আরাধনা করতেন সর্বসমক্ষে। এর পরের ইতিহাস আর কিছু জানা যায় নি। সবটাই ইতিহাসের নীচে চাপা পড়ে আছে। কণিষ্কের মৃত্যুর পর সেই বুদ্ধমূর্তি কোথায় গেল কি হল কেউ তা জানে না।

'রামমাণিক্যবাবুর কথামত দ্বিতীয় যবনিকা উঠল ১৭৩৯ সালে যখন নাদির শা' ভারত আক্রমণ করলেন। মুঘল বাদশাদের দুর্বল চরিত্র আর হীনবলের জন্যে নাদির শা'কে সেদিন রোধ করা সম্ভব হয়নি। দিল্লীর সিংহাসন তছনছ করে তিনি তদানীন্তন বাদশাকে বন্দী করলেন। লুঠ করলেন নগদ পনের কোটি টাকা, শাহজাহানের প্রিয় ময়ূর সিংহাসন আর কোহিনুর। এ ছাড়াও ছিল হাজার হাজার গরু, ঘোড়া, হাতী আর উট। এসব হল ইতিহাসের ব্যাপার। কিন্তু সব থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস যেটা, সেটা হল সেই হীরের বুদ্ধমূর্তি। কোথা দিয়ে আর কেমন করে কে জানে দিল্লীর কোষাগারে হয়ত বন্দী হয়েছিলেন অহিংসার প্রচারক বুদ্ধদেব।

'কিন্তু মজাটা সেখানেই। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কণিষ্ক ছিলেন প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজপুরুষ। অত দামী বুদ্ধ মূর্তিকে তিনি প্রকাশ্যে ফেলে রাখতে চাননি। ঐ বুদ্ধমূর্তির জন্যে পৃথিবীতে তোলপাড় কাণ্ড হয়ে যাবে এটা বোধ হয় তিনি অনুমানই করেছিলেন। তাই সেটিকে তিনি অতি কৌশলে বন্দী করেছিলেন একটি সোনার ঈগলের পেটে। আর ঈগলের পেটে লুকনো বুদ্ধ মূর্তির ইতিহাস না জেনেছিলেন দিল্লীর কোন মুসলমান বাদশা, না জেনেছিলেন স্বয়ং নাদির শা'। তিনি কেবল একটি সোনার হার পেয়েছিলেন। যার লকেটে একটি ঈগলের প্রতিমূর্তি। খুব সম্ভবত সুদৃশ্য ঈগলের লকেট সমেত হারটি লুঠ করার পর তিনি গলায় পরেছিলেন।

'বোধ হয় বুদ্ধদেবের ইচ্ছে ছিল না নাদির শা'র সঙ্গে পারস্যে ফিরে যেতে। তাই যুদ্ধোন্মত্ত নাদির শা'র গলা থেকে সোনার ঈগলটি ছিটকে পড়ে যায়

যুদ্ধক্ষেত্রেই। সেদিন নাদির শা' যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতেন সোনার ঈগলের মধ্যে কি সম্পদ লুকনো আছে তাহলে হয়ত দিল্লী চষে ফেলতেন ঐ একটা সোনার হারের জন্যে। কিন্তু সামান্য একটা সোনার জিনিসের জন্যে তিনি আর কালক্ষেপ করেননি। লুঠ যা করেছেন তার তুলনায় একটা সোনার হারের মূল্যই বা কতটুকু ?

'তারপর ঘটনাচক্রে সেই হার এসে পড়ল মল্লিকদের এক' পূর্বপুরুষের হাতে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক শ্রেষ্ঠী বা বণিক। ব্যবসার জন্য তখন তিনি দিল্লী ছিলেন। একজন সামান্য সৈনিক হারটি কুড়িয়ে পায় যুদ্ধক্ষেত্রে। ন্যায্যমূল্যে ব্যবসায়ী মল্লিকমশাই সেটিকে কিনে নেন সৈনিকটির কাছ থেকে।

'রাজা মহারাজার ঘরে গিয়ে সোনার ঈগলটি অবহেলায় পড়েছিল। তাঁরা বিশেষ কেউ সেদিকে নজরই দেননি। যেমন দেননি নাদির শা'। সৈনিকটিও বোধহয় নগদপ্রাপ্তিতে উল্লসিত হয়ে সোনার ঈগল নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। এক ব্যবসাদারের কাছে অমন ভারি সোনার জিনিসের একেবারে মূল্য থাকবে না তা হতে পারে না। যতই কেন সোনার দাম তখন কম থাক। কৌতূহলবশত জিনিসটি খুঁটিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন এক অমূল্য সম্পদ। সেই হীরের বুদ্ধমূর্তি। এবং ওটি যে কণিষ্কের তৈরী তার প্রমাণ পাওয়া যায় এখানেই। সোনার ঈগলের পালকে পালিভাষায় কণিষ্কের নাম খোদাই করা ছিল। সনটাও লেখা ছিল ৭৮ খৃষ্টাব্দ। অবশ্য ছড়ার রচয়িতা উনি নন। এই সোনালী পাথরের বুদ্ধমূর্তি যিনি তৈরী করেছিলেন ছড়াটা তাঁর।

'বুদ্ধদেবের করুণাই হোক বা হীরের পয়মন্তই হোক মল্লিকদের ধারণা ঐ হারটিই তাদের বংশের সব সৌভাগ্যের প্রতীক। কারণ এরপর থেকে সেই সামান্য বণিক দিনে দিনে ধনী হয়ে উঠলেন। করলেন বিস্তর জায়গা জমি। দেখতে দেখতে হলেন জমিদার।

'কাহিনী অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। মল্লিকদের সেই পূর্বপুরুষটির দিনে দিনে ধনী হওয়ার ইতিহাস শোনা আপনাদের পক্ষে বিরক্তির কারণ হতে পারে। ও প্রসঙ্গ থাক। চলে আসুন রামমাণিক্যের বাবা রামকিংকর মল্লিকের আমলে।

'জমিদারীর অবস্থা তখন পড়ো পড়ো। অত্যাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতায় কুবেরের ভাণ্ডারও শেষ হয়ে যায়। রামকিংকর বা তাঁর বাবা পয়সা ওড়ানোয় কেউ কারো থেকে কম যাননি। রামকিংকরের দুই ছেলে। রামমাণিক্য আর রামানুজ। কিন্তু দুই ছেলে দুই রকমের। বড় রামমাণিক্য বংশ ছাড়া। তিনি ছিলেন সৎ, ধার্মিক আর ন্যায়বান। যা এ বংশের পক্ষে একেবারেই

বেমানান। আর ছোট রামানুজ একেবারে পূর্বপুরুষদের প্রোটোটাইপ। মদ্যপ, জুয়াড়ী এবং আনুষঙ্গিক আর সব কিছুতেই তার সমান আসক্তি।

'বৃদ্ধ বয়েসে রামকিংকর নিজের ভুল বুঝেছিলেন। তাঁর সারাজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম জমিদারীর শেষ তলানিটুকু যদি ছোট ছেলের হাতে গিয়ে পড়ে তাহলে মল্লিক বংশকে শেষপর্যন্ত ভিক্ষে করে খেতে হবে। তাই মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সম্পত্তির বেশীটাই দিয়ে গেলেন রামমাণিক্যকে। ছোটকেও বঞ্চিত করলেন না। যৎসামান্য সেও পেলো। আরো একটা জিনিস দিয়ে গেলেন বড় ছেলের হাতে। একটা রুপোর থালা। সেখানে খোদাই করা আছে একটা হেঁয়ালী।

'মৃত্যুর ঠিক আগেই তিনি রামমাণিক্যকে বলেছিলেন মৃগনাভির এই বাড়িতে কোথাও একটা জায়গায় লুকনো আছে একটি সোনার ঈগল। যার দাম লক্ষ লক্ষ টাকা। তিনি নিজে সারাজীবনেও খুঁজে পাননি। কারণ হেঁয়ালীর মানে তার পক্ষে বার করা সম্ভব হয়নি। রামমাণিক্য যদি তা খুঁজে পান যেন তিনি সেটা সৎভাবে খরচ করেন। বংশের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।'

নীল এবার একটু থামল। টেবিলে রাখা জলের গ্লাস থেকে কয়েক চুমুক জল খেল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'চলুন আরো কয়েকটা বছর টপকে যাই। এর মধ্যে যা ঘটেছে তা সংক্ষেপে হল পূর্ববঙ্গের সব জমিদারী বিক্রি করে ন্যায্য ভাগ অনুসারে ছোট রামানুজকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে রাম-মাণিক্য স্ত্রীর হাত ধরে চলে এসেছিলেন পলাশমায়ায়। এ বাড়িটা তাঁরই ভাগে পড়েছিল। আর রামানুজ তার ভাগের অর্থ নিয়ে তার স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে রামশঙ্করের হাত ধরে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন। তার আর কোন সংবাদ ছিল না।

দীর্ঘ পনের বছর পর ছদ্মবেশে তিনি ফিরেছিলেন পলাশমায়ার এই বাড়িতে। তাও দিন কয়েকের জন্য। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে।

'সে যাই হোক, নিজের সবকিছু খুইয়ে একদম শূন্য হাতে এসে ওঠেন দাদার কাছে। তার দাবী অন্যায় করে তার বাবা বড় ভাইকে বেশী সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। রামানুজ অবশ্য সেই সম্পত্তির জন্যে ফিরে আসেনি এসেছে হীরের বুদ্ধমূর্তির জন্যে। যা লুকানো আছে সোনার ঈগলের মধ্যে। সেই ঈগলটি তার চাই। এই বাজারে ওটার দাম বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। এটা তাদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। রামকিংকরের বুড়ো বয়েসে ভীমরতির জন্যে সেই সম্পত্তির একমাত্র মালিক রামমাণিক্য হতে পারে না। রামানুজেরও তাতে অধিকার আছে। অবশ্য রামানুজ পুরোটাই চায় না। বিক্রি করে যা পাওয়া

যাবে তার দশ আনা তাকে দিতে হবে আর ছ আনা পাবে রামমাণিক্য। যেহেতু তার ছেলে আছে, রামশঙ্কর। রামমাণিক্যের কোন ছেলে নেই। তাই এই দশ আনা ছ আনা ভাগ। তাছাড়া অত নগদ অর্থ দিয়ে সোনার ঈগল কেনার জন্যে খদ্দেরও সেই যোগাড় করে এনেছে। দালালী হিসেবেও তার একটা ভাগ থাকবে বৈকি।

'এইসব আবদারে কথাবার্তা শুনে রামমাণিক্যের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। যতই শান্ত আর ধার্মিক হোন না কেন, জমিদারী রক্ত তার মধ্যেও ছিল। তাছাড়া তাঁর নিজের অবস্থাও খুব ভালো ছিল না। কোনরকমে মৃগনাভির এই বাড়িটায় পুরনো অর্থ ভাঙিয়ে দিন চলছিল। বেহিসেবী বা উড়নচণ্ডী ছিলেন না বলেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মাঝে কিছুদিন ব্যবসার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে পিছিয়ে এসেছিলেন ব্যবসা থেকে। সেদিন রামানুজকে সরাসরি তিনি হাঁকিয়ে দিলেন। যুক্তিহীন অন্যায় ব্যাপার স্যাপার তিনি কোনদিনও সহ্য করতে পারেননি। তাছাড়া যে গুপ্তধনের জবাব নিতে রামানুজ এসেছে সেই গুপ্তধনের সন্ধানও তিনি পাননি।

'কিন্তু রামানুজ দাদা রামমাণিক্যের কোন কথাই বিশ্বাস করেন নি। শাসিয়েছিলেন তিন দিনের মধ্যে যেমন করেই হোক সেই সোনার ঈগল চাই। নইলে সে দাদাকে খুন করতেও পিছিয়ে যাবে না।

'তিনদিন পরও যখন রামমাণিক্য জানালেন গুপ্তধন কোথায় আছে তা তিনি জানেন না তখন ভাইকে মারার আগে শেষ চেষ্টা করল বৌদির মুখ যদি খোলা যায়। রামানুজ ভেবেছিল দাদা রামমাণিক্য নিশ্চয় গুপ্তধনের হদিশ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীর কাছে। কারণ গুপ্তধনের কারণে যদি রামমাণিক্যকে খুন হতে হয় তাহলে পরবর্তীকালে স্ত্রীর হাতে সেই সম্পত্তি আসার কোনই অসুবিধা হবে না।

'চার দিনের দিন সন্ধ্যেবেলায় সে বৌদিকে ছাদে ডেকে নিয়ে যায়। প্রথমে মিষ্টি কথায় গুপ্তধনের সন্ধান চায়। কিন্তু সত্যিই রামমাণিক্যের স্ত্রী গুপ্তধনের কথা জানতেন না। তিনি স্পষ্টই বলেন "আমরা এ বাড়ির বৌ বটে। কিন্তু কর্তাদের সম্পত্তি টম্পত্তি-কোথায় থাকে তা বৌদের পক্ষে জানা সম্ভব না।" রামানুজ সে কথা বিশ্বাস করেনি। তর্ক, বচসা শেষ পর্যন্ত গায়ে হাত দিতেও পিছুপা হয় নি। অবশেষে নিজেকে আর ঠিক রাখতে না পেরে বৌদিকে রাগের মাথায় ধাক্কা দেয়। ধাক্কাটা জোরই হয়েছিল। সামলাতে না পেরে তিনি উঁচু ছাদ থেকে গড়িয়ে পাশের নীচু ছাদে পড়ে যান। এবং আচমকা পড়ার জন্যেই তাঁর মৃত্যু হয় সঙ্গে সঙ্গেই।

'এতটার জন্যে রামানুজ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তখন যা হবার তা হয়ে

গেছে। বাধ্য হয়ে এটাকে আত্মহত্যা বলে প্রমাণ করার জন্যে সে তিনতলা উঁচু ছাদ থেকে একদম নীচে গড়িয়ে ফেলে দেয় বৌদির অসাড় দেহটা।

'পুলিস সেদিন যে কোন কারণেই হোক কেসটা সল্‌ভ্‌ করতে পারেনি। "কেস অব সুইসাইড" হয়ে ফাইল চাপা পড়ে গিয়েছিল।'

এই সময় এক সেকেণ্ডের জন্যে নীল থামতেই সুকোমলবাবু বললেন, 'কিন্তু রামানুজের কি হল?'

'রামানুজ নিরুদ্দেশ হল অতি সহজেই। গ্রামবাসীরা কেউই তাকে চিনত না। মাত্র কয়েক দিনের জন্যে সে এসেছিল। তাও ছদ্মবেশে। কিন্তু সে মৃগনাভি গ্রাম ছেড়ে চলে গেল না। ছদ্মবেশ খুলে নিজের চেহারায় ফিরে এল রামহরি দত্ত নাম নিয়ে। মৃগনাভি ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। কারণ সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত মল্লিকভবনের মধ্যেই গুপ্তধন এখনো লুকনো আছে। গুপ্তধন যে তার দাদার হাতে পড়েনি এটাও সে বুঝতে পেরেছিল। কারণ গুপ্তধন পাবার পরেও দাদার অর্থনৈতিক অবস্থা এতটা খারাপ থাকতে পারে না। এদিকে ধরা পড়ার ভয়ে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও পাচ্ছিল না।

'এইবার আসরে এল শম্ভু। যেই শম্ভু সেই শঙ্কর। রামানুজের ছেলে রামশঙ্করই শম্ভুর ছদ্মবেশে রামমাণিক্যের কাছে কাজের লোক হিসেবে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু সুবিধে হল না। কারণ রামমাণিক্য লোকটার শরীরে জমিদারের রক্ত থাকলেও লোকটা আসলে ছিল শান্তিপ্রিয়, ঘরকুনো আর স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর সংসারের প্রতি আর কোন টানই ছিল না। ভেঙেও পড়েছিলেন। একরকম মনস্থির করে ফেলেছিলেন বাড়িটা বিক্রি করে কোথাও চলে যাবেন।

'সংসারের প্রতি বীতরাগের আরো একটা কারণ ছিল। তিনি জানতেন তাঁর ভাই বিশেষ ভালো লোক না। শান্তিপ্রিয় হওয়ার জন্যে বিপদের আগেই সব ভাগবাঁটোয়ারা করে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ভাই আর কোনদিন জ্বালাতন করতে আসবে না। কিন্তু দীর্ঘদিন পর ভাই ফিরে এসে কেবল দাবী না, মৃত্যুর ভয় দেখাতেও দ্বিধা করে নি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল ভাই রামানুজই তার স্ত্রীকে খুন করেছে। সোনার ঈগলের লোভে সে যে আবার এসে হামলা করবে না এমন বিশ্বাস তিনি করতেন না। যতশীঘ্র এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয় সেই চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। মাত্র কয়েক হাজার টাকায় তিনি বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন চন্দ্রভূষণ গুপ্তার কাছে।

'শম্ভু একদিকে নিরাশ হল। কারণ সে ভেবেছিল ও বাড়িতে চাকরের

কাজ নিয়ে ঢুকতে পারলে নিজেই সোনার ঈগলের খোঁজ করবে। কিন্তু তড়িঘড়ি বাড়ি বিক্রি হতে চাকরিটা হাতছাড়া হয়ে গেল। অবশ্য সে দমে গেল না। চন্দ্রভূষণবাবু বাড়ি কিনে সারাতে শুরু করলেন। কারণ বাড়ির তখন দৈন্যদশা।

'এই সুযোগ শম্ভু বা রামানুজ কেউই ছাড়ল না। শম্ভু গিয়ে দাঁড়ালো চন্দ্রভূষণবাবুর কাছে। চন্দ্রভূষণবাবুও একজন লোক্যাল কেয়ারটেকার পেয়ে বেঁচে গেলেন। কলকাতায় তাঁর বেশ শাঁসালো ব্যবসা। সে সব ছেড়ে ত' রোজ বাড়ি সারাইয়ের কাজে তদারকী করে সময় নষ্ট করা যায় না। শম্ভুর ওপর সব ছেড়ে দিলেন।'

আবার নীল থামল। মিনিট খানেক কি যেন ভাবল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'এইখানে একটা কথা আপনাদের জেনে রাখা দরকার। রামমাণিক্যবাবু এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরই রাষ্ট্র হয়ে হয়ে গেল বাড়িটা ভূতের। লোকেরা নানান রকম অলৌকিক দৃশ্যও দেখতে শুরু করল।'

প্রবলভাবে নিজের ঘাড় দোলাতে দোলাতে নীল বলল, 'দেখবেই ত'। কেননা মানুষ যে ভূত দেখতে বা ভূতের ভয় পেতে ভালবাসে। ঝিপঝিপে বৃষ্টির রাত, টিমটিমে কেরোসিনের আলো আর গা ছমছমে ভূতের গল্প. বলতে পারেন কার না ভালো লাগে ? হাজার ভয় পেলেও আমি ত' কাউকে জমাটি ভূতের গল্পের আসর ছেড়ে উঠে যেতে দেখি নি। কথা যেমন কানে হাঁটে ভয় তেমনি মনে হাঁটে।

'সমস্ত অঞ্চলটায় মল্লিক ভবনের ভূতের গল্প ছড়িয়ে পড়ল লোকের মনে মনে। এসব কৃতিত্ব কিন্তু বিজনবাবুর। বিজনবাবু আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন জাপানে ওনাদের লোহালক্কড়ের ব্যবসা ছিল। তা না। জাপানে ওঁর ঠাকুর্দা একটা ইলেকট্রিকের দোকান খুলেছিলেন। সেই দোকান একটা বড় ফ্যাক্টরীতে পরিণত হয়েছিল।

'কিন্তু বিজনবাবুর বাবা ছিলেন কবি প্রকৃতির। তিনি এসব ব্যবসা-ট্যাবসা দেখতেন না। বিজনবাবুর তখন বয়স অল্প। তাছাড়া ঐ বয়েসে তিনি অসৎ সঙ্গে পড়েন। উনি টাকা রোজগার করার থেকে খরচ করায় আনন্দ পেতেন বেশী। ঠাকুর্দা মারা যাবার পর বাবার উদাসীনতার জন্য ব্যবসাটা গেল উঠে। তবে কোন মানুষই একেবারে নির্গুণ হয় না। কিছু কিছু গুণ সে আয়ত্ত করে। যেমন বিজনবাবু জাপানে থাকা কালীন দুটো জিনিস উনি ভালো শিখে-ছিলেন। ইলেকট্রিকের কাজ। এর প্রমাণ পাই ওঁর বাড়িতে একটা কাঁচের পাল্লার দেওয়াল আলমারির মধ্যে। সেখানে প্রচুর মডার্ন ইলেকট্রিক গুড্‌সের সরঞ্জাম। তখনই আমার সন্দেহ হয়। উনি বলেছিলেন উনি অর্ডার সাপ্লাইয়ের

কাজ করেন। কিন্তু যে লোক বিভিন্ন জিনিসের অর্ডার সাপ্লাই করে তার পক্ষে ঐ ভাবে জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখার কোন যুক্তি নেই। তার ওপর সরঞ্জাম-গুলো সবই ব্যবহৃত ইলেকট্রিকাল গুড্‌স্‌।

'অসৎ পথে বিরাট অঙ্কের টাকার লোভ যদি না থাকত, তাহলে ওঁর মত পাকা এবং লাইট অ্যান্ড শেডের অবিশ্বাস্য খেলা দেখাবার মত মিস্ত্রির খেয়ে পড়ে সৎভাবে বাচাঁর মত অর্থের অভাব হত না। স্টেজ বা ফিল্‌ম্‌ ওঁর মত আলোকসম্পাত শিল্পীকে লুফে নিত।

'চন্দ্রভূষণবাবু বা অনাদিবাবু বা এই অঞ্চলের আরো অনেকে মল্লিক ভবনে যেসব ভূতুড়ে দৃশ্য দেখেছেন সেগুলো আর কিছুই না, সবই বিজনবাবুর শিল্পী-সত্তার বিকাশ। সবই আলোছায়ার খেলা। স্টেজে জল ঢোকানো বা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট যে কায়দায় আমরা দেখি, গলাকাটা মানুষের দেহ অথবা ছাদের উপর জ্বলন্ত মানুষের চলাফেরা, সবই বিজনবাবুর আলোর মায়া। এখন হয়ত আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন—এসব উনি দেখালেন কি ভাবে ?

'নিশ্চয়ই এটা একটা ভাবার মত প্রশ্ন। বাড়ি কিনলেন চন্দ্রভূষণবাবু বা অনাদিবাবু। সেখানে বিজনবাবু রাত্রে কিভাবে ঢুকবেন ? আমার উত্তর হল বিজনবাবুর ঢোকার কোন প্রশ্নই উঠে না। আলোকসম্পাত শিল্পী ত' আর প্রতিদিনই উপস্থিত থেকে নিজের হাতে মেসিন অপারেট করেন না। করে তার সহকারীরা। বিজনবাবুর আলোর খেলা দেখাতো প্রধান সহকারী শম্ভু। চন্দ্রভূষণবাবু বাড়ি কিনে সারাতে শুরু করলেন সেটা ত' আগেই বলেছি। কিন্তু সুযোগটা সম্পূর্ণ নিল রামানুজের দল। অর্থাৎ রামানুজ, তার ছেলে রামশঙ্কর আর বিজনবাবু।

'আপনাদের মধ্যে অনেকেই এ বাড়ির দোতলায় ওঠেননি। উঠলে দুটো দেখার মত জিনিস দেখতে পেতেন। একটা বিরাট বেলজিয়াম কাঁচের আয়না আর একটা রঙীন কাঁচের ফ্রেশকো। দুটো জিনিসই দেখার মত। আর এই দুটো জিনিসই বিজনবাবুর মগজে আলোর খেলা দিয়ে ভূতুড়ে অ্যাটমসফিয়ার তৈরী করার বুদ্ধি যোগায়। বুদ্ধিটা আগাগোড়াই বিজনবাবুর। উনিই এদের মাথায় ঢোকান যে ঐ বাড়িতে ভূতের ভয় দেখানো শুরু করলে আর কেউ ওখানে এসে বাস করবে না। ফলে বাড়িটা ফাঁকা থাকবে। আর ফাঁকা থাকলেই সুবিধে। তন্নতন্ন করে ওরা সোনার ঈগল খুঁজে দেখার সুযোগ পাবে।

'রাজ-মিস্তিরিদের হাত করে বিজনবাবু নিজের মত করে ইলেকট্রিকের কাজ করে নিল। এইখানে বলে রাখি। এই ব্যাপারে কাঁচের ফ্রেশকোর যে একটা ভূমিকা আছে সেটা প্রথমে আমার মাথায় আসেনি। মাথায় এসেছিল তেরো চোদ্দ বছরের এই ছেলেটির। ঐ প্রথম বুঝতে পারে কাঁচের ফ্রেশকোর

মধ্যে কোন রহস্য লুকনো আছে। কৃতিত্বটা তাতনেরই। পরে আমি নিজে সবটা আবিষ্কার করি। রাত্রে লুকিয়ে অনাদিবাবুর ঘরের পাশের ঘরে বসে থাকি ঘন্টার পর ঘন্টা। জানতে চেষ্টা করি কিভাবে ঐ ফ্রেশকোটাকে কাজে লাগানো হয়েছে। একদিন সব রহস্য ধরেও ফেলি।

'যে দেওয়ালে ফ্রেশকোটা সিমেন্টিং করা হয়েছে দেওয়ালটা খুব চওড়া। অবশ্য এ বাড়ির সব দেওয়ালই বেশ চওড়া। সেই দেওয়াল ড্রিল করে গর্ত করা হয়। রঙীন কাঁচগুলোর পিছনে ফিট করা হয় বাল্ব। তারপর অদ্ভুত উপায় দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে তার টেনে নিয়ে যাওয়া হয় ছাদের ওপর রাখা লাইট পাসারের কাছে। সেখানে ফিট করা আছে একটা ডিমার। ডিমারের গায়ে আছে অনেকগুলো সুইচ।

'শেখ আবদুল্লা নামে একজন রাজমিস্ত্রিকে দিয়ে এ কাজগুলো করানো হয়। প্রবীণ মিস্ত্রি। এখন অনেক বয়েস। কাজকর্মও ছেড়ে দিয়েছে। তার কাছ থেকেই আমি এই সব তথ্য যোগাড় করি। লোকটা অবশ্য এই চক্রান্ত কিছুই জানত না। বড় লোকের খেয়াল হিসেবেই সে নির্বিকারচিত্তে কাজগুলো করে দিয়েছিল।

'এরপর চন্দ্রভূষণবাবু যখন একরাত্রের জন্য বাগান বাড়িতে এলেন ইয়ার দোস্ত নিয়ে তখন সবার অলক্ষ্যে শম্ভু ছাদে গিয়ে এয়ার পাসারের গায়ে লুকিয়ে রাখা ডিমারের সুইচ কন্ট্রোল করে ভয় দেখানোর পালা শুরু করে দেয়। বড় আয়নাটা এই খেলায় খুব সাহায্য করে। সমস্ত প্রতিচ্ছবিটা আয়নায় রিফ্লেক্ট করে ভয়টাকে বা ভৌতিক দৃশ্যটাকে চতুর্গুণ বাড়িয়ে দেয়। ব্যাক গ্রাউন্ড ছিল সমস্ত ঘরের ব্লু কালার। তার ওপর সে রাত্রে তারা ছিল মদ্যাসক্ত। রঙীন চোখে সাধারণ জিনিসকে অসাধারণ দেখতে কোন অসুবিধা নেই। চন্দ্রভূষণবাবু যে চোখের সামনে ভূতের নৃত্য দেখছিলেন বা ভূতের ঘুষি খেয়েছিলেন তা কেবল দুটি কারণে সম্ভব হয়েছিল। এক উনি সে রাত্রে মদ্যপান করেছিলেন। আর, কোন একজন সুঅভিনেতা সমস্তটা অভিনয় করেছিল। ভুতুড়ে ঘুষিটা সেই মেরেছিল।

'চন্দ্রভূষণবাবু চলে যাবার পর বাড়িটা দশবছর খালি পড়ে ছিল। কিন্তু দশ বছরেও রামানুজের দল সোনার ঈগল খুঁজে পায়নি। পাওয়া সম্ভবও না। চোখের সামনে দিনের পর দিন দেখেও অনাদিবাবু জানতে পারেননি কি মহামূল্যবান জিনিস তিনি অনাদরে রেখে দিয়েছেন। ইয়েস আই অ্যাম স্পীকিং অব দ্যাট বুদ্ধমূর্তি। হেঁয়ালীটা না পেলে বা সমাধান করতে না পারলে আমার কাছেও বুদ্ধের মূর্তি কেবল স্প্লেনডিড আর্টওয়ার্ক হয়েই থাকত।

'আসলে কি জানেন, অতি মূল্যবান কিছু যদি খুব সাধারণভাবে ফেলে

ছড়িয়ে রাখা যায় তাহলে সেটা চট্ করে লোকের চোখে পড়ে না। এ ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। মল্লিক ভবনের সারা বাগানে নানান পাথরের অনেক স্ট্যাচু আছে। অত স্ট্যাচুর ভীড়ে একটা বুদ্ধমূর্তি কে আর খুঁটিয়ে দেখে। কিন্তু দশ বছর পর অনাদিবাবু বাড়ি কিনে গোটা বাড়ি রিনোভেট করেন। ঐ সময় গাড়ি-বারান্দার নীচে ঐ বুদ্ধমূর্তি দেখে উনি সযত্নে সেটিকে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। কারণ, অনাদিবাবুর স্ত্রী বেশ ধর্মভীরু। ওঁরই ইচ্ছেতে এটি ঘটে ছিল। কিন্তু উনি জানতেন না এর মধ্যে কি আছে। যেমন বহুবার দেখার পরও মল্লিক বংশের কেউই বুদ্ধদেবের স্ট্যাচু নিয়ে মাথা ঘামাননি।

'যাই হোক, এদিকে সাজিয়ে গুছিয়ে বসা অনাদিবাবুকেও তাড়ানো দরকার। অপরাধীরা শুরু করল পুরনো কায়দায় ভয় দেখানো। পরপর ছ'দিন খেলা দেখালো। সাত দিনের দিন খেলার মাত্রা দিল বাড়িয়ে। সেদিন রাত্রে বিজন-বাবুও এসেছিলেন এ বাড়িতে। এয়ার পাসারের কাছে বসে যেমন ভাবে স্টেজে আলোর সাহায্যে জীবন্ত মানুষের গলা উড়ে যাবার দৃশ্য দেখানো হয়, সেই ভাবেই কাটামুণ্ডুর ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য দেখানো হয়েছিল।

'আলোর খেলা শেষ। এবার আসুন খুনগুলো কেন করা হল সেই প্রশ্নে। যত রক্তপাত সব ঐ সোনার ঈগলের জন্যেই। আপনারা বুঝতেই পারছেন, রামমাণিক্যবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুটা কিছুটা আকস্মিক। খুনীর ইচ্ছে ছিল না তাঁকে খুন করার। কিন্তু ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল। এবারে আসা যাক টমি। বাড়িতে যদি ওরকম একটা বাঘা অ্যালসেসিয়ান থাকে তাহলে অপরাধীর দারুণ রিস্ক থেকে যায়। প্রভুভক্ত কুকুরকে বিশ্বাস নেই। বিসদৃশ কিছু দেখলেই সে চীৎকার করে জানিয়ে দেবে। আমরা এসেই দেখেছিলাম কুকুরটা কেবলি ঘুমোয়। একটা কুকুর দিনে রাতে সর্বদাই ঝিমোয় এ হয় না। বিশেষ করে বাড়িতে অচেনা কোন লোক এলে সে অন্তত একবার উঠে গিয়ে তাকে ভালো করে শুঁকে দেখবে। কখনো কখনো চীৎকারও করতে পারে। কিন্তু আমরা তিনজনে প্রথম যেদিন এবাড়িতে এলাম সে ঘুমচ্ছে। এমনকি প্রভু বাড়িতে আসার পরও সে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এল না। এটা আমার কাছে বিরাট সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরে ব্যাপারটার 'আসল সত্য জানতে পেরেছিলাম'।

'নেশাটা শম্ভু করত না। নেশা করার ভান করত। লোককে সে বুঝিয়েছিল সন্ধ্যের পর তার আর কোন জ্ঞান থাকে না। আসলে টমিকে সে খাবারের সঙ্গে আফিম খাওয়াত।

'তবু বেচারীকে মারা পড়তে হল। তার কারণ অনাদিবাবু। রামানুজ যখন দেখল কিছুতেই অনাদিবাবু এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না, তারও পর আবার

গোয়েন্দা ডেকে এনেছেন তখন তারা ঠিক করল অনাদিবাবুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। টমিকে যে রাত্রে মারা হয় সেদিন অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে শম্ভু তার মারণাস্ত্র মানে বিশেষ সাঁড়াশী নিয়ে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে যাবার বন্দোবস্ত করছিল।'

এই সময় হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছাদে কেন?'

নীল বলল, 'ছাদে না গেলে অনাদিবাবুর ঘরে ঢুকবে কেমন করে?'

'কিন্তু ছাদে যাবে কেমন করে? দোতলায় যাবার সিঁড়িত' বন্ধ থাকে।'

'অনাদিবাবুর বাড়ির লাগোয়া পূবদিকে একটা বড় বটগাছ আছে, সেটা সবাই জানে। যে কোন সমর্থ লোক গাছে উঠে তার একটা ডাল ধরে ছাদে লাফিয়ে পড়তে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু টমির সেদিন কি খেয়াল হয়েছিল জানি না। অত্যন্ত চেনা লোক শম্ভুকেও ঐ ভাবে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরোতে দেখে তার কোঁচার খুঁটটা কামড়ে ধরেছিল। অনেক করে ছাড়াবার চেষ্টা করেও সে পারেনি। তখন বাধ্য হয়েই—।

'পরদিন টমির মুখে আমি একটুকরো কাপড়ের পাড়ের অংশ পাই। সেটা শম্ভুরই কাপড়ের অংশ। ছেঁড়া কাপড়টা ওর বাক্সের মধ্যেই পাওয়া গেছে। এখন সুকান্ত দারোগার জিম্মায় কাপড় এবং কাপড়ের অংশ দুটোই জমা আছে। জমা আছে একটা ফতুয়া। সেটাও শম্ভুর। সুন্দরীকে খুন করার সময় শম্ভু ওটাই পরেছিল। কাদার দাগ, রক্তের দাগ আর গায়ের গন্ধ যা ফতুয়ায় পাওয়া যাবে ফোরেনসিক পরীক্ষার পর আমার বিশ্বাস সেগুলো এই কেসের বিরাট প্রমাণ হিসেবে সাহায্য করবে।'

'কিন্তু সুন্দরীকে কেন খুন করা হল বললি না ত'?'

'যে জন্যে টমিকে মারা হল সুন্দরীহত্যার মূল কারণ ওটাই। সেদিনও রাত্রে ওরা অনাদিবাবুকে খুন করার সুযোগ নিয়েছিল। শম্ভু ওর মারণাস্ত্র নিয়ে গাছেও উঠেছিল। নীচে দাঁড়িয়ে ছিল বিজন দাস। কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি সুন্দরী অতরাত্রে ঐখানে এসে হাজির হবে। আমার যতদূর ধারণা ও বিজনবাবুকে চিনে ফেলেছিল। খুব সম্ভবত চেঁচাতেও গিয়েছিল। কিন্তু শম্ভু গাছ থেকে নেমে এসে পেছন থেকে গলায় সাঁড়াশী আটকে ওকে মেরে ফেলে। তারপর দুজনে মিলে সুন্দরীর দেহটা টেনে নিয়ে গিয়ে ধানক্ষেতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

'সে রাত্রে বাগানে তিনজন এসেছিল। দুজন ঐ অপকর্মটি করে। আর একজন আমার গেস্ট হাউসের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। তাতনের আচমকা লাথি খেয়ে লোকটা হকচকিয়ে যায়। এবং অন্ধকার বাগানের মধ্যে ছুটতে শুরু করে। সে সাধু। কারণ ওর হাতের টিপ ভালো

না। এলোপাথাড়ি দুটো গুলি চালায়। অবশ্য আনাড়ির মার। তাতনের গায়ে গুলি লাগলেও লাগতে পারত। বরাত জোরে লাগেনি। খুনের প্রবলেম মিটল। এবার আসুন গুপ্তধনের রহস্যভেদে। সত্যিকথা বলতে কি, আগেও বলেছি গুপ্তধনের রহস্য উদ্ধার করতে পারতাম না যদি সেদিন তারকবাবু আমাকে কলকাতায় রামমাণিক্যবাবুর ঠিকানা না দিতেন। রামমাণিক্যবাবুর সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনীয়তা আমিও উপলব্ধি করেছিলাম। কিন্তু কোথায় রামমাণিক্যবাবুর ঠিকানা ? চন্দ্রভূষণবাবু ঠিকানা বলতে পারেননি। পুরনো ডায়েরী ঘেঁটে যে ঠিকানা তারকবাবু দিয়েছিলেন সেখানে গিয়েও ওঁকে পাইনি। তারপর অনেক জিজ্ঞাসাবাদ অনেক খোঁজাখুঁজির পর কলকাতার এক এঁদো গলিতে একতলার জরাজীর্ণ ঘরে ওঁকে, বলতে পারেন প্রায় আবিষ্কারই করি।

'ওঁর এখন অনেক বয়েস। বোধহয় সত্তর প'চাত্তর হবে। রোগপাণ্ডুর শীর্ণ চেহারা, একগাল সাদা দাড়ি-গোঁফ আর চুলের জঙ্গলে আসল মানুষটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কানেও কম শোনেন, চোখেও কম দেখেন। আমার ওঁর কাছে যাবার আসল উদ্দেশ্যটাই বোঝাতে আধঘণ্টা সময় লেগে গিয়েছিল। যাই হোক সব শুনেটুনে উনি অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন, তারপর বলেছিলেন, কি হবে আর পাঁক ঘেটে ? উত্তরে আমি বলেছিলাম খুনীর শাস্তি হোক এটা কি আপনি চান না ? অবশ্য অপরাধী কে তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাদের ধরার একমাত্র উপায় গুপ্তধনের সন্ধান তাদের দিয়ে দেওয়া।'

বৃদ্ধ ক্ষীণ হেসে আমায় বলেছিলেন 'ফাঁদ পাততে চাও ?'

'উত্তরে বলেছিলাম, 'ঠিক তাই। আর এ ব্যাপারে আপনিই পারেন আমাকে সাহায্য করতে।'

"কি ভাবে ?'

"গুপ্তধনটা কোথায় আছে বোধহয় আপনি সেটা অনুমান করতে পারেন।"

"তাই যদি পারব তবে আর আমার এই অবস্থা হয় ? আমি জানিনা কোথায় আছে। তবে একটা সূত্র আমি দিতে পারি। জানিনা তা দিয়ে তুমি কিছু করতে পারবে কিনা।"

"বেশতো দিন না আপনার সূত্র, চেণ্টা করে দেখি।"

"তবে দেখো" বলে তিনি মাথার বালিশের তলা থেকে একটা চাবি বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "আমার তক্তার নীচে একটা লোহার বাক্স আছে। এই চাবিটা দিয়ে সেটা খোল। পুরনো কিছু জামাকাপড় আলোয়ান এখনও ওটার মধ্যে আছে, সেগুলোর নীচে দেখবে একটা রুপোর থালা আছে। ওটা বার করে নিয়ে এস।"

আমি তাই করলাম। থালাটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বুকের ওপর চেপে ধরে রইলেন, তারপর বললেন, 'আমার বাবা মারা যাবার সময় এই থালাটা দিয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটা ধাঁধা লেখা আছে। উনি বলেছিলেন এই ধাঁধাটা সল্‌ভ্ করতে পারলে রাজার ঐশ্চর্য পাওয়া যাবে। তবে চেষ্টা কোরো মল্লিক বংশের ঐতিহ্য বজায় রাখতে। নেহাৎ দুর্দিন না এলে ওটাকে বিক্রি কোরো না। রামানুজকে সন্ধান দিও না। সে হয়েছে আমার মত। দুদিনেই বেচে ফুটকড়াই করে দেবে। তাই তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।''

'এতগুলো কথা বলে বৃদ্ধ হাঁফাতে লাগলেন। তারপর কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইলেন। তারও খানিকক্ষণ পর রুপোর থালাটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস করে এটা তোমার হাতে দিলাম। হাজার দুরবস্থার মধ্যে পড়ে এটাকে আমি বিক্রি করিনি। আশা করব তুমি এটা আমায় ফেরৎ দিয়ে যাবে।'

'তবে থালাটা আমি নিইনি। কারণ সেখানে বাংলায় খোদাই করা ছিল একটা ছড়া। ছড়াটা টুকে নিয়ে থালাটা ওঁকে ফেরৎ দিয়ে দিই।

'এরপরই তিনি আমাকে ধীরে ধীরে মল্লিক বংশ এবং সোনার ঈগলের প্রাচীন ইতিহাস যা তাঁর জানা ছিল সব শুনিয়ে ছিলেন।

'ছড়াটা আপনারা শুনেছেন। এবার আমি তার মানেটা বলে দিচ্ছি। ছড়ার প্রথম লাইন হল, ''কবন্ধ নরেশ ভজেন গুরু''। কবন্ধ নরেশ মানে সম্রাট কণিষ্ক। তার আধ্যাত্মিক চেতনার গুরু হলেন মহামতি বুদ্ধ। মানেটা দাঁড়াল, সম্রাট কণিষ্ক বুদ্ধদেবের ভজনা করেন। কি ভাবে করেন? আসুন পরের লাইনে। সেখানে লেখা আছে, ''হাজার বাতি জেবলে''। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কণিষ্ক যখন সম্রাট তখন তিনি কি আর প্রদীপের টিমটিমে আলোয় বসে বুদ্ধের উপাসনা করবেন? স্বভাবতই তিনি হাজার বাতি জেবলে উৎসব করে পুজো করবেন। কিন্তু আমি বলব না। ''হাজার বাতি জেবলে'' এই বাক্যটা দিয়ে ছড়াকার এক অমূল্য জিনিসের সন্ধান দিয়ে গেছেন। সেটা কি জানার আগে পরের লাইনটার ব্যাখ্যা করি। তাহলে সুবিধা হবে। সেখানে লেখা আছে ''গুরুর অন্তরে আছেন গুরু'' অর্থাৎ বুদ্ধের অন্তরে মানে ভিতরে আছেন গুরু মানে বুদ্ধ।'

একমাত্র তারিণী সেন বাদে এই সময় সবার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শীৎকার শুনলাম। প্রত্যেকে যেন নীলের কথাগুলো গিলছে। এবং পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। নীল আর ধৈর্যচ্যুক্তি ঘটাল না। ও বলল, 'হ্যাঁ তাই। একফোঁটাও মিথ্যে না। সামনে ঐ যে দেখছেন বুদ্ধমূর্তি। ওর মধ্যেই আছে আর এক বুদ্ধ। কিন্তু তার আগে পরের লাইনটার মানে জেনে নিন। ''সোনার পাখি পেলে।'' আবার ধোঁকা। এখানে সোনার পাখি

আসবে কোথা থেকে ? আসবে। আসবে। এই দেখুন, বলেই ও ধীরে ধীরে মূর্তিটার কাছে এগিয়ে গেল। হাতে করে তুলে নিন মূর্তিটা। ডান হাত দিয়ে প্রথমে মূর্তির মুখটা বাঁ দিকে প্যাঁচ ঘোরালো। তারপর ডানদিকে স্ক্রু খোলার মত প্যাঁচ আল্‌গা করতে করতে সমস্ত মাথাটাই খুলে টেবিলের ওপর রাখল। বিরাট একটা হাঁ মুখ দেখা দিল। নীল ধীরে ধীরে মূর্তির গহ্বরে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনল সোনার একটা হার। আর আমরা সবাই স্পষ্ট দেখলাম হারের লকেটে একটা সোনার ঈগল। দীর্ঘদিন ঐ ভাবে থাকার দরুন সোনার উজ্জ্বল্য কিছুটা ম্লান। তবে সোনা সোনাই। আঁস্তাকুঁড়ে থাকলেও তা সোনা। আর এই দেখুন এইখানে এই পালকে নীচে খোদাই করা আছে সম্রাট কণিষ্কের নাম আর শকাব্দ।'

আমার একবার জিনিসটা স্পর্শ করে দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল। কারণ জিনিসটার ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য। কত রাজাবাদশার হাত ঘুরে এসেছে ঐ সোনার ঈগল। শেষ ঐতিহাসিক চরিত্র নাদির শা'। ভাবতেও শরীরে এক অন্যরকম শিহরণ লাগে। নাদির শা' একদিন এই লকেট নিজের গলায় পরেছিলেন।

নীলের কিন্তু এত ভাবাবেগ নেই। অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক কাট কাট গলায় ও বলল, 'শেষের লাইনটা মনে করুন সবাই, "সোনার পাখি পেলে"। এই সেই সোনার পাখি। আর এর মধ্যেই আছে দ্বিতীয় লাইনের মানে "হাজার বাতি জেবলে।" সম্রাট কণিষ্ক হাজার বাতি জেবলে কেন তার গুরুর ভজনা করতেন জানেন ? এবার তাহলে দেখুন।' বলেই নীল সোনার ঈগলের পেটের নীচে একটা বিশেষ স্থানে চাপ দিল। আশ্চর্য হয়ে আমরা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখলাম পাখির পেটটি ধীরে ধীরে দুদিকে সরে যাচ্ছে। অনেকটা আধুনিক কায়দায় স্বয়ংচালিত লিফ্‌টের দরজার মত। তারপর··· ।

জীবনে আমি এত আলো এক সঙ্গে দেখিনি। সেই দিনের বেলাতেই সমস্ত ঘরটা যেন ঝকমক করে উঠল। তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে রশ্মিটাকে আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে হল সমস্ত ঘরটায় কেউ যেন হাজার হাজার বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

চোখ ধাঁধানো ভাবটা কাটলে আমরা সকলেই অবাক বিস্ময়ে নীলের প্রসারিত ডান হাতের তালুর ওপর দেখলাম ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্তি। আড়াই সেন্টিমিটারের মত লম্বা সম্পূর্ণ হীরের তৈরী বুদ্ধদেব।

কতক্ষণ সবাই অভিভূতের মত তাকিয়ে ছিলাম জানি না। মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরব আর নির্বাক আমরা সবাই। এই অবস্থাটা নীল কিন্তু বেশীক্ষণ জিইয়ে রাখল না।

ধীরে ধীরে যে মূর্তিটিকে যথাস্থানে চালান করে দিয়ে বলল, 'ভগবান তথাগত সারা পৃথিবীতে প্রেম আর অহিংসার পথে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কল্পনাও করতে পারেন নিজের অনিচ্ছায় একদিন তিনি তিন-তিনটি প্রাণের অকাল-মৃত্যুর কারণ হবেন। বোধহয় এই জগতের নিয়ম।'

নীল তার বক্তব্য শেষ করল। সোনার ঈগলকে যথাস্থানে প্রেরণ করে বুদ্ধের মূর্তিকে আবার সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'এবার নিশ্চয় আপনাদের কাছে সব পরিষ্কার কেন এই অপরাধ, কি তার রহস্য আর কারা সেই অপরাধী। অনাদিবাবু, এবার নিশ্চয় আমাকে ছুটি দেবেন ?'

অনাদিবাবু কিছু উত্তর দেবার আগে একটা 'হুঁ' শব্দ শুনলাম। তার মানে তারক প্রামাণিক কিছু বলতে চাইছেন। সবাই ওঁনার দিকে মুখ ফেরাতে দেখলাম উনি নিভন্ত চুরোটে অগ্নিসংযোগ করছেন। ফুঁ দিয়ে কাঠিটাকে নিবিয়ে বললেন 'ব্যানার্জী, তোমার তদন্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্যতা রাখে। আর কেউ স্বীকার না করলেও আমি করি। কিন্তু তোমাকে আমার দুটো প্রশ্ন করার আছে। প্রথমত, শম্ভু ওরফে রামশঙ্কর আর রামহরি দত্ত ওরফে রামানুজ মল্লিক, এদের মোটিভটা বোঝা গেল। তারা যা কিছু করেছে তা তাদের বংশের হৃত সম্পত্তি নিজেদের দখলে আনবার জন্যে। কিন্তু বিজনবাবুর মোটিভ কি ? তাঁর ত' কোন সম্পর্ক নেই এদের সঙ্গে। নিশ্চয় এ সম্বন্ধে তুমি কোন স্থির সিদ্ধান্তে এসেছ।'

'এসেছি। এবং সেটাই সত্যি। আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাদের বলেছিলাম বিজন দাস জাপানে থেকে দুটো জিনিস শিখেছিল। একটা আগে বলেছি আর দু নম্বর স্মাগলিং। ইন্টার ন্যাশান্যাল স্মাগলিং গ্রুপে ও একটি চাঁই। ওর নাম বিজন দাস নয়। ওটা ওর ছদ্মনাম। ওর আসল নাম উটামারো দাস।'

হঠাৎ তুহিন জিজ্ঞাসা করল 'আপনি সেটা কেমন করে জানলেন মিঃ ব্যানার্জী।'

'যেমন করে আর সব কিছু জেনেছি। বোধ হয় আমার জানার ইচ্ছেটা প্রবল বলে।'

তুহিন বোধ হয় লজ্জিত হল। আসলে ও উত্তেজিত হওয়ার দরুন প্রশ্নটা ঠাট্টার মত শুনিয়েছিল, তাই ও বলল, 'না, না, আপনি কিছু মনে করবেন না মিঃ ব্যানার্জী, প্রশ্নটা আমি সেভাবে করতে চাইনি, মানে—'

'লালবাজারে বিখ্যাত বিখ্যাত ক্রিমিন্যালদের একটা তালিকা আছে। তাতেই কুখ্যাত স্মাগলার উটামারো দাসের নাম পাওয়া যাবে। ওর এগেনস্টে অনেক

কেস ঝুলছে। পুলিস ওকে খুঁজেও বেড়াচ্ছে। ওর ইনটারেস্ট বা মোটিভ একটাই। ভারতবর্ষের বুক থেকে এমন মহামূল্যবান এবং ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তি পৃথিবীর যেকোন দেশ লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে কিনে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে বসে আছে। এবার নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন মিঃ উটামারো দাসের লাভটা কি এবং কোথায় ?'

এবার বিমলবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু উটামারো জানল কিভাবে হীরের বুদ্ধ মূর্তির কথা।'

হুংকার দিয়ে উঠলেন হুঁ, কিসস্যু বোঝেনা, তবু এলোপাথারি প্রশ্ন করা চাই।'

বিমলের আঁতে ঘা লাগল। সেই বলল, 'আপনি ত' বোঝেন। তাহলে আপনিই বুঝিয়ে দিন।'

'রামানুজবাবু ত' জানেন হীরের বুদ্ধ মূর্তির কথা ! সেটা তাদের পারিবারিক ইতিহাস। উটামারোর মত স্মাগলার ছাড়া ও মূর্তি হাতে পেলেও বিক্রি করা যাবে না সেটা রামানুজবাবু ভালো করেই জানতেন। তাই। বুঝলে কিছু ছোকরা ?'

'কিন্তু একজন বাঙালী আর একজন আধা বাঙালী আধা জাপানীর সঙ্গে পরিচয় হল কেমন করে ?'

'হুঁঃ, আচছা গবেটদের নিয়ে পড়া গেলত ! একজন জাপানীর সঙ্গে একজন ভারতীয়ের আলাপ হওয়াটা কি জগতের নবম আশ্চর্যের মধ্যে পড়ে নাকি ? যত্তসব হুঁঃ। আচ্ছা ব্যানার্জী, আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও, সাধুটা কে ?'

নীল বলল, 'সাধু একটা মামুলী ছোকরা। উটামারোর এখানকার কুকর্মের সঙ্গী !'

'কিন্তু ওকে তুমি অ্যারেস্ট করলে কিভাবে ? আই মীন হাত পা বেঁধে তোমার ঘরে আটকালে কি ভাবে ?'

'আমি জানতাম আমার বা আমার ঘরের ওপর এদের দলের নজর আছে। এমন কি এটাও জানতাম প্রতি রাত্রেই সাধু আমার ঘরের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়। একদিন মানে যে রাত্রে সুন্দরী খুন হয় সেদিন তাতনের লাথি ওই খেয়েছিল। ফাইন্যাল মূর্তি উদ্ধারের দিনেও আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম দলের লোকেরা যখন ওদিকের কাজ করতে ব্যস্ত থাকবে তখন সাধুই আমাদের গেস্ট হাউসে যাবে। সে লক্ষ্য রাখবে আমরা ঘরে আছি কিনা। যদি ঘরে থাকি টর্চ জেবলে শম্ভুকে সংকেতে জানিয়ে দেবে। এর কারণ আমরা বাইরে থাকলে ওদের পক্ষে নিঝঞ্ঝাটে কাজ সারা অসুবিধের। সাধু যথারীতি গেস্ট হাউসের জানলার পাল্লা তুলে দেখল ঘর অন্ধকার। কিন্তু

পরক্ষণেই শুনল এলোমেলো কিছু কথা ঘরের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে। সাধু হল নিঃসন্দেহ। আমরা ঘরেই আছি। সংকেত জানাল তিনবার টর্চ জেবলে। তারপরই চোর আসরে নামল চুরি করতে। কিন্তু সাধু জানত না সে নীল ব্যানার্জীর সঙ্গে টেক্কা দিতে গেছে। সবটাই ছিল আমার সাজানো। কারণ ঘরে তখন কেউই ছিল না। ছিল একটা মোটা চাদর চাপা টেপ রেকর্ডার। যে টেপ রেকর্ডার জানলা খুললেই কথা বলতে শুরু করবে। তারপর আমি অপেক্ষা করেছিলাম তার সংকেত পাঠানো পর্যন্ত। যেই সে সংকেত দিল সঙ্গে সঙ্গে তাকে পেছন থেকে ধরাশায়ী করতে আমার এক মিনিট সময় লেগেছিল। দু মিনিট লেগেছিল তাকে ঘরে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেতে। আরো দুমিনিট সময় লেগেছিল ওকে দিয়ে দু ছত্র লিখিয়ে নিতে। কারণ আমার জানার ছিল আমাকে সাবধান করে কে ছড়া লিখত। সাধুই লিখত। ওর হাতের লেখার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। তারপর আরো দুমিনিট সময় নিয়েছিলাম সরু নাইলন রোপ দিয়ে ওকে কায়দা করে বাঁধার জন্যে। আমাকে লেখা ছড়া যে সাধুর হাতের লেখা তার আরো একটা প্রমাণ আছে। যে কাগজে ছড়া লেখা হয়েছিল সেখানে নস্যির গন্ধ পেয়েছিলাম। পরিমল নস্যি। গন্ধটা উগ্র। এখানে সু-কোমলবাবু নস্যি নেন। কিন্তু সাধু ছাড়া পরিমল নস্যি আর কেউ নেয় না—। আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে?'

দেখলাম সবাই নীরব। কারো মুখে কোন কথা নেই। প্রত্যেকেই হয়ত কেসটার কথা ভাবছিলেন। কেবল ঠকাস্ করে শব্দ হতেই দেখলাম তারিণী সেনের ঢুলন্ত মাথাটা ঠুকে গেছে শ্বেতপাথরের শক্ত টেবিলে।

জগতে যে এখনও নবম আশ্চর্যের কিছু আছে সেটা টের পাইয়ে দিলেন তারিণী সেন। করমচার মত লাল চোখ চশমার ওপর দিয়ে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'তাহলে বন্দুটা কে পাবে? অনাদি না রামমাণিক্য?'

এও কি সম্ভব? যে লোকটা সারাক্ষণ সমানে ঘুমিয়ে গেল সেই লোকটা এমন ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন করে কি করে? হয় লোকটার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল নয়ত লোকটা ঘুমোয় না। আমার কাছে তারিণী সেন বিস্ময়।

'একটা প্রশ্ন আছে' হাত তুললেন তুহিন, 'সাঁড়াশি দিয়ে কেন মারা হত—'

'খোঁজ নিয়ে দেখবেন মৃগনাভি মিউনিসিপ্যালিটিতে পাগলা শেয়াল কুকুর ধরার কাজ করত শম্ভুদত্ত বলে একটা লোক। সেই শম্ভুদত্ত আর এই রামশংকর মল্লিক একই লোক।

কিছুতেই একটা সাতাশের গাড়িটা ধরা গেল না। অনাদিবাবুর আতিথেয়তা আর গ্রামবাসীদের অভিনন্দনের ঠ্যালায় তিনটে, সাঁইত্রিশই ধরতে হল। গাড়ি আসতে তখনও মিনিট তিনেক বাকী সিডিউল টাইম অনুসারে। হঠাৎ দেখি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন সুকান্ত দারোগা, 'সন্দেহজনক সন্দেহজনক—'

নীল দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি হল ছুটতে ছুটতে আসছেন কেন? আবার সন্দেহজনক কি ব্যাপার হল?'

সারা গালে হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'স্যার, এভাবে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে হয়? আমার গিন্নি বড় আশা করেছিল—'

'দাসবাবু, আজ একটু তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরতে চাই—তাই দেখা করতে পারলাম না—আপনি ওঁকে বুঝিয়ে বলবেন আবার এসে ওনার হাতের মুরগীর মাংস খেয়ে যাব—।'

'সে আপনি লক্ষবার আসুন আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু ভগিনী তার ভাইয়ের জন্যে এটি পাঠিয়েছেন। নিজের হাতে তৈরী স্যার। খেলে আপনি ভুলতে পারবেন না। আর না নিলে বড় মনোকষ্ট পাবে স্যার আপনার ভগিনী।'

হেসে প্যাকেটটা নিতে নিতে নীল বলল 'কি আছে এতে দাসবাবু?'

'বিগ সাইজ নারকোল নাড়ু!'

'ওঃ লাভ্‌লি। ইট ইজ্‌ অ্যাকসেপ্টেড।'

'থ্যাংকু স্যার। ভেরী সন্দেহজনক—।'

গাড়ি এসে গেল। আমরা উঠে পড়লাম। একমিনিট দাঁড়ায়। হুইসল্‌ দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। হাত নাড়তে লাগলেন অনাদিবাবু আর মিঃ দাস।

ভেবেছিলাম গল্পটা এখানেই শেষ হবে। হল না। পরের স্টেশনটা ছাড়াতেই বিচ্ছু তাতন বলে উঠল, 'নীলকাকু খুব ফাঁকি দিয়ে গল্পটা শর্টকাটে সেরে এলে?'

নীল ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শর্টকার্ট মানে ?'

'আমি ভেবেছিলাম অন্তত আর কেউ প্রশ্নটা করুক না করুক এককালের ঝানু পুলিশ অফিসার তারক প্রামাণিক এ প্রশ্নটা করবেই। কিন্তু তিনিও করলেন না। ভুলে গেলেন না প্রশ্নটা মনেই আসেনি বুঝতে পারছি না।'

'পাকামী করিস না। কি প্রশ্ন বল্ ?'

'রামানুজের দল কি করে জানতে পারল সোনালী পাথরের বুদ্ধমূর্তির মধ্যেই সোনার ঈগল আছে ?'

'ভেরী ভেরী ইনটেলিজেন্ট প্রশ্ন। এবং এও জানতাম তুইই এ প্রশ্নটা আমায় করবি। তুই কি মনে করিস কেবল তোদের সাহসের দৌড় দেখবার জন্যে একজন পাকা বনেদী বুড়ো সেজে গিয়েছিলাম ?'

'না, একবারও তা মনে করিনি আর এও মনে করিনি সামান্য টেপরেকর্ডার লুকিয়ে আনার জন্য তুমি বুড়োটুড়ো সেজেছ। আসল উদ্দেশ্যটা কি বল।'

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নীল বলল 'বলেছিলাম না ভালোমাছ পেতে গেলে কষে চার ছড়াতে হয়। বুড়ো সেজে গিয়ে আমি যখন তোদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছিলাম তখনই বুঝেছিলাম আমার মেকআপ পারফেক্ট হয়েছে। আর সেই মেক আপ নিয়ে আমি সন্দেহজনক প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বুঝিয়ে এসেছিলাম যে বিশ লক্ষ টাকা হলেও ও বাড়ি আমি কিনব। কারণ ওই বাড়ির মধ্যে একটা বুদ্ধ মূর্তি আছে। তার মধ্যে আছে সোনার ঈগল। সেই ঈগলের পেটে আছে অমূল্য এক হীরে দিয়ে তৈরী বুদ্ধের মূর্তি। আর দাম কমসে কম—ব্যাস। তাতেই কাজ হাঁসিল। আর কিছু প্রশ্ন করবি ?

তাতন বলল—'সেদিন ঢিল মেরেছিল কে ? পেত্নীর আওয়াজ কে করছিল ?'

'দুটোই সাধু, ওর গলাটা কি রকম মেয়েলী মেয়েলী শুনলি না ? অজু, তোর কোন প্রশ্ন আছে ?'

'মূর্তিটা ত' রামমাণিক্যবাবুরই পাওয়া উচিত ?'

'নাঃ কেউই পাবে না কারণ, ওটা এখন ভারত সরকারের সম্পত্তি। কিন্তু তাতন এবার তোমার টাস্‌কে পেয়েছো গোল্লা—'

'জানি। আমি কি আর নীল ব্যানার্জী।'

বলেই ও জানলার বাইরে চোখ রাখল। গাড়ি তখন মানুষ-ঘর-বাড়ি পেছনে রেখে ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে।

—